বস্ত্রবিতরণ

বস্ত্রবিতরণ

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৬০
মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদশিল্পী
সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

অংশু শূরকে

সূচিপত্র

ফুলের চারা	৭
মৃৎশিল্পী পরেশ পাল	১৩
দালাল	১৮
মাটির ওপরে	২৪
আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের শেষদিন	৩০
আপনার আজকের দিনটি	৩৫
রূপকথা	৪০
ত্রিসীমানায়	৪৬
অন্তঃপুরবাসিনী	৫৩
রোদ আসে না	৫৭
বোধিদ্রুম	৬৪
চূর্ণিত শিরায়	৭৪
কেন এত ঢেউ	৮২
বিস্মরণ	৯১
দিকনির্ণয়	৯৮
খনন	১০৬
বস্ত্রবিতরণ	১১৪

ফুলের চারা

কলকাতা থেকে মাত্র ৪২ কিলোমিটার দূরে সবুজের রংটা যে এমন করে বদলে যায় জানতো না সুহাসিনী। একঘণ্টা আগেও সে বোঝেনি সবুজ রঙে এমন বেদনা, এত মায়া, এত আকুলতা, এত লাবণ্য আছে। এখন যে-পথ দিয়ে যাচ্ছে সে, সেখানে কোথাও নিস্তব্ধ তরুলতা, কোথাও ঘন জঙ্গল, কোথাও ছায়াময় পুকুর, কখনও সেলাই মেশিনের শব্দ। হলুদ শাড়িপরা মেয়েটিকে নিয়ে কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে চলে যায় সাইকেল রিকশার তরুণ চালকটি। সুহাসিনী হেঁটেই চলেছে। গ্রামটা দেখতে চায়। দেখছে। দেখছে চারপাশ। এই সময়টুকু তার দরকার। কিভাবে কি বলবে সব ভেবে নিচ্ছে। এই ভেজা ভেজা দুপুরের নীরব গ্রাম্যতায় সুহাসিনী একলা চলেছে। একজন বৃদ্ধকে জায়গাটা কোথায়, সে জিজ্ঞেস করেছিল। বৃদ্ধ যেন সেটা বলার জন্যেই অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছিল ওই উঠোনে।

যে ফুটবল মাঠটার কথা বুড়ো বলেছিল, যে মন্দিরটার কথা বলতে গিয়ে কপালে দুহাত ঠেকিয়ে বুড়ো প্রণাম করেছিল, যে ক্লাবঘর, যে মনিহারি দোকান, যে একতলা বালিকা বিদ্যালয় দেখতে পাবার কথা, পরপর সবই সে পেয়ে যাচ্ছে। এবং সেই বাগানের সামনে এসে পৌঁছে যায় সুহাসিনী। ভেতরে ঢুকে যায়। অসংখ্য ফুলের চারা। তার সামনে তখন গন্ধে মিশে যায় রং, সবুজের রং।

'কাকে চাই?'

'অবনীশ দত্ত কি আপনি?'

'আপনি চেনেন আমাকে?'

'চিনলাম তো।'

'বসুন, বসুন, কোত্থেকে আসছেন আপনি?'

'কলকাতা।'

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'আপনার স্ত্রী হেমকুসুম দত্ত...'

'আমার স্ত্রী! হেমকুসুম' অবাক হয়ে যায় অবনীশ দত্ত। সে তো কোন যুগের কথা। সে সব কবেই মুছে গেছে। এতদিন পরে আবার? কি হয়েছে তার? 'হ্যাঁ, তিনি আমার স্ত্রী ছিলেন।'

'ছিলেন কেন? আপনাদের তো ডিভোর্স হয়নি। তিনি আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।'

'আপনি এত সব জানলেন কি করে?'

'আমি আপনার একমাত্র মেয়ে। আমার নাম সুহাসিনী দত্ত।' একমাত্র কন্যাটির দিকে চেয়ে থাকতে কোথায় যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করে অবনীশ। এই তার মেয়ে? ষোল বছর আগে

তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল হেমকুসুম। কখনও হেম কখনও কুসুম। সে কুসুম আর ফিরে আসেনি। হাসির বয়েস তখন চার। ষোল বছর পরে সেই ছোট্ট মেয়েটাকে আজ আর চেনার কোনও উপায় নেই। এখন সে যুবতী, তেমনই সুন্দর, যে সুন্দরী নারী চিরকালই পুরুষের অচেনা থেকে যায়।

'তুমি এখানে এলে কি করে?'

'কেন, বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে।'

'স্টেশন থেকে আমার বাড়ি তো অনেক দূর।'

'আপনার বাগান এখানে সবাই চেনে।'

'তোমরা এখন আছো কোথায়?'

'যতীন দাস রোডে।'

'তুমি কলেজে পড়ো?'

'হ্যাঁ। ব্রেবোর্নে। ইকনমিক্‌স।'

'এসো, ভেতরে এসো।'

দুজনে উঠে আসে। ঘরটা এতই পরিষ্কার এতই নিখুঁত করে সাজানো, বোঝা যায় এ ঘরে একজন পুরুষ একা থাকে না। কিন্তু আর কাউকে তো দেখছে না সুহাসিনী। মেয়েরা ব্যবহার করে এমন কোনও জিনিসও ঘরের মধ্যে কোথাও নেই। অবনীশকে চিনতে পারার কোনও কারণ নেই। বাবার চেহারা যেটুকু তার মনে ছিল, তার সঙ্গে এই চেহারার কোনও মিল নেই। ইউক্যালিপটাস গাছের মতো লোকটার গায়ের রং। শীর্ণ, উদাস, বিহ্বল একজন মানুষ। যার শরীরে এই ভাঙন, তার ঘরে এত উচ্ছ্বাস? এই তার বাবা, জীবনযুদ্ধে যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে পরাজয়ের ছায়া।

'হেমকুসুম দত্ত এবার রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে আপনি জানেন?'

'জানি।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'করো।'

'মার কাছে শুনেছি আমি নাকি জন্মেছিলাম মার বিয়ের পাঁচ বছর পরে। আমার চার বছর বয়েসে মা আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে। এই ন বছরে যে সাতখানা উপন্যাস মা লিখেছিল সেই সব কটা উপন্যাসের প্লট মা আপনার কাছেই পেয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি নিজে লিখতেন না কেন?'

'কেন, তোমার মা কিছু বলেনি?'

'বলেছে। বলেছে, তাহলে তোর মা যে লেখক হতো না। এটা কি সত্যি?'

'না, এটা সত্যি নয়।'

'এই যে ফুলের চারা, এই যে বিরাট বাগান এটা আপনি একাই দেখাশোনা করেন?'

'না। এক সময় ছ সাত জন লোক কাজ করতো। এখন সব ছাড়িয়ে দিয়েছি। এখন শুধু গোবিন্দ বলে একটা লোক আছে। ব্যবসা তো আর আগের মতো চলে না। আমারও উৎসাহ নেই। কোনওরকমে দিন চলে গেলেই তো হল। একসময় পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় যেতো আমার ফুলের চারা। প্রচুর টাকা হয়েছিল। বেশ কটা রাজবাড়িতে যেতো আমারই ফুলের চারা।

একচেটিয়া নয়, কিন্তু যথেষ্ট ভালো ব্যবসা। তখন উৎসাহ ছিল, উদ্যম ছিল। অ্যাম্‌বিশান ছিল। কতো ছুটে ছুটে বেড়াতাম। এখন আর চারা কোথাও পাঠাই না। কলকাতা থেকে যারা এসে নিয়ে যাবার তারা নিয়ে যায়। একসময় বম্বে মাদ্রাজ হায়দারাবাদেও আমার ফুলের চারা লোকে নিয়ে গেছে। এখন আর পরিশ্রম করতে পারি না, কোনও কিছুতেই কোনও আগ্রহ নেই। দাঁড়াও, একটু চা করে আনি।'

'তুমি করবে কেন? কোথায় কি আছে দেখিয়ে দাও, আমি করে দিচ্ছি।'

'না না তুমি বোসো না, এত কষ্ট করে এসেছ।'

পাশের ঘরে অবনীশ চা করতে চলে যায়। দেয়ালের র‍্যাক থেকে একটার পর একটা বই নামিয়ে দেখতে থাকে সুহাসিনী। গল্প উপন্যাস ইতিহাস দর্শন বাংলা ইংরেজি সব আলাদা আলাদা করে সাজানো। একদিকে হেমকুসুম দত্তের লেখা একগাদা বই। সেই প্রথম দিককার বইগুলো যেমন রয়েছে তেমনি এখনকার উপন্যাসগুলোও সব পরপর বড় যত্ন করে রাখা হয়েছে। অবনীশ ছোট্ট একটা ট্রেতে দুকাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে ঢোকে। তাদের অবস্থা যথেষ্ট ভালো হওয়া সত্ত্বেও এরকম জুঁই ফুলের মতো রঙের চায়ের কাপ সে কখনো দ্যাখেনি।

'হেমকুসুম দত্তকে তুমি ভুলতে পারোনি।'

'ওর বইগুলো দেখে মনে হলো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'হেমকুসুম দত্ত যে বড় ঔপন্যাসিক, এতে কোনও সন্দেহ নেই। যোগ্য লোককেই ওরা পুরস্কার দিয়েছে।'

'তোমার আনন্দ হয়নি?'

'আনন্দ? নাঃ। দুঃখ আনন্দ অভিমান কোনও কিছুই হয়নি। আমার কোনও প্রিয় লেখক, কেউই যেমন আমার পরিচিত নয়, হেমকুসুমও তাই। আগের চেয়ে ও এখন অনেক ভালো লেখে।'

'কিন্তু তুমিই একদিন ওকে লেখক করেছিলে।'

'ভুল। একদম ভুল। কেউ কাউকে লেখক করে দেয় না। প্রতিভা পরিশ্রম নিষ্ঠা এসবই একজনকে লেখক করে। এসব ছাড়া কেউ শিল্পী হয় না।'

'এই এত বছরের মধ্যে মা'র কাছে ফিরে যাবার কথা তোমার কোনও দিন মনে হয়নি?'

'না। তবে যখনই ওর কোনও বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছি, কলকাতায় গিয়ে কিনে এনেছি।'

'এর মধ্যে কোনওদিন কোথাও মাকে দেখতে পাওনি?'

'না। কলকাতায় এখন খুব কমই যাই।...চল্‌ তোকে আমার বাগানটা দেখাই।'

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

অবনীশ দত্ত একটির পর একটি ছোট ছোট ফুলের চারারপাশে দাঁড়িয়ে মেয়েকে সেগুলোর পরিচয় দিতে থাকে। কোন সময়ের ফুল কোন মাটিতে, কোন সারে, কেমন রোদে, কেমন জলে, কোন চারা কেমন বেড়ে ওঠে, ফুলে গন্ধ আসে প্রকৃতির কোন খেয়ালে, অবনীশ তার মেয়েকে বলে যেতে থাকে। কতো যত্ন, কতো তোয়াজ করতে হয়। সুহাসিনী সবই শোনে, শুধুই শোনে। কিছুই তার মাথায় ঢোকে না। কারণ ট্রেনে বসে সারাক্ষণ যে কথাটা তার মাথায় ঘুরছিল এখনও সেটাই ভাবছে। কেন তার মা চলে গিয়েছিল? আর কখনও ফিরে যায়নি কেন? সে জানে তার মা বড় জেদী, সব সময় নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে, নিজের ধারণা, নিজের বোধ বিশ্বাস চাপিয়ে

দেওয়ার চেষ্টা করে। অথচ কলম নিয়ে বসলেই সে মা একেবারে অন্য মানুষ। তাহলে কি নিজের জীবনযাপনের সঙ্গে লেখার কোনও সম্পর্ক নেই? যে জীবন সে কাটায় আর যে জীবনের ছবি সে ফুটিয়ে তোলে, এ দুয়ের মধ্যে কি কোথাও কোনও যোগ নেই? কি এমন অপরাধ ছিল এই লোকটার? এমন একটা মানুষের সঙ্গে কি করে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়? সত্যিই কি এমন উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল যা তার মায়ের সহ্যের সীমা ছড়িয়ে গিয়েছিল? মার সহ্যশক্তিটা যে নেই বললেই চলে, সেটা সে ভালো করেই জানে। সে জানে মার শরীরে একটা জিনিস একটু বেশি মাত্রাতেই রয়েছে, তার নাম ক্রোধ। তাহলে কি বিরোধটা শুরু হয়েছিল সেখান থেকেই?

কি করে জিজ্ঞেস করবে এই কথাটা? হোক না সে অনেক দূরের মানুষ, তারই তো বাবা। নিজের বাবাকে কি এরকম একটা প্রশ্ন করা যায়? যদি উত্তর না দেয়? যদি রেগে যায়? তবু করতেই হবে, জানতেই হবে, এই সুযোগ হয়তো আর আসবে না কখনও?

তখন তার সমস্ত শরীরে ফুলের চারা থেকে উঠে আসে এক দিশাহারা গন্ধ, কী মোহে যেন জড়িয়ে দেয় সমস্ত চেতনা। এখন সে দেখতে পায়, এই মানুষটির জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষা-উচ্চাশা সবই যেন অপূর্ণ রয়ে গেল, যেন মানুষটি জীবনের কাছে আর কখনও কিছু পেতেও চায় না। আঘাত পাবে লোকটা, পুরোনো একটা যন্ত্রণা আবার হয়তো জ্বালা ধরিয়ে দেবে তার শরীরে। ধীরে ধীরে শক্ত হবার চেষ্টা করে সুহাসিনী। আজ জেনে তাকে যেতেই হবে।

'কী হবে এসব জেনে?'

'না জানলে এই কষ্টটা যে আমার থেকেই যাবে।'

'জানলে লাভটা কি হবে? তার চেয়ে এই অজানাটা যেমন আছে তেমনি থাক না।'

'এই সত্যটা আমার জানার দরকার আর সেজন্যেই তোমাকে আজ সব খুলে বলতে হবে।'

'সব কি বলা যায় মা? ওই ন বছর সময়টা যে একটা বিরাট সময়।'

'আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই, মা তোমাকে ছেড়ে চলে গেল কেন?'

'ফুলের চারার ব্যবসা। সমস্ত দিনটা ট্রেনে বাসে বাগানে কেটে যায। আমি জানতাম হেমকুসুম ছোটগল্প লেখে। বিয়ের পর মাস ছয়েক আর কাগজ কলম নিয়ে বসেনি। একদিন বললাম, লেখাটা বন্ধ কোরো না হেম। ও বলল, একটা প্লট দাও। সরকারি বাসে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছিলাম। একা। অনেকটা তো রাস্তা। যাচ্ছিলাম ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতে। বসে থাকতে থাকতে মাথায় একটা প্লট এসে গেল। এখনও মনে আছে গল্পটা গুছিয়ে ফেললাম লোধাশুলির কাছে। ওকে শোনালাম। লিখতে শুরু করল। সেটা আর গল্প থাকল না। হয়ে গেল উপন্যাস। একটা নামকরা পুজোসংখ্যায় ছাপা হল। হৈ হৈ পড়ে গেল। তার পর থেকে ওর একটার পর একটা উপন্যাসের কাহিনী আমার মাথা থেকেই এসেছে। কেউ জানল না সেটা। জানলেই বা কি হতো? কাহিনীটাই তো সব নয়। বিন্যাসটাই আসল। চরিত্রগুলোকে রক্তমাংসে জীবন্ত করে তোলা, সে কাজটাই তো কঠিন। কাহিনীটা ছড়িয়ে দেয়া, গল্পটাকে ধরে রাখা এসবই আসল কথা। হেম আমাকে বলল, বেরোচ্ছে তোমার মাথা থেকে, বাহবা পাচ্ছি আমি, আমি আর লিখব না। কিন্তু আমার সময় কোথায়? সময় থাকলেই কি পারতাম? লিখতে ক জন পারে? কতো রকম প্লট মাথায় ঘুরে বেড়ায়, তাহলে কি সব নষ্ট হয়ে যাবে? আমি জোর করলাম। ও আবার লিখতে আরম্ভ করল।'

অবনীশ উঠে জল খেল। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মনে পড়ল কতো রাত জেগে ব'সে থাকতে হয়েছে এই মেয়েকে নিয়ে। তখন কে জানতো, একদিন এই মেয়ে এসে এমন প্রশ্ন করবে? তার প্রতিটি দিন থেকে অনেক দূরে তারই মেয়ে এত দ্রুত বড় হয়ে উঠেছে সে তো জানতেও পারেনি। সে ছিল না ঠিকই, তবু ঈশ্বরের পৃথিবীতে আলো জল বাতাস থেকে বঞ্চিত হয়নি তার মেয়ে। বড় হতে হতে তার মেয়ে দেখবে শুধু জগতের মালিন্য, দেখবে বিচ্ছেদে এত বিদ্বেষ, এমন তো কথা ছিল না। অবনীশ মেয়ের হাতে বাড়িয়ে দিল জলের গেলাস। দেখল চার বছর বয়েসের অভ্যেসটা এখনও রয়ে গেছে, তার মেয়ে গেলাসটা দুহাতে ধ'রে জল খায়।

'তুই তার নাম শুনিসনি। সূর্যকান্ত যাত্রা করত। প্রচণ্ড নাম। কি পালা লোকে দেখতো না, দেখতো সূর্যকান্ত আছে কিনা। ওর নামে কতো রাবিশ যে উতরে যেত। যাবেই তো। ছ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা, গায়ের রং তো রং নয় জ্যোতি। আমার কাছে আসতো ফুলের চারা নিতে। কী যে ফুলের শখ ছিল কি বলব তোকে। তিনসুকিয়া গিয়েছিল যাত্রা করতে। অভিনয় করতে করতেই মঞ্চের ওপর অসুস্থ হয়ে পড়ল। এক ঘণ্টার মধ্যে সারা জীবনের জন্যে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পক্ষাঘাত। মোহনবাড়ি থেকে প্লেনে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। বড় বড় ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছে। কিচ্ছু হয়নি। সূর্যকান্ত যতবার এই বাগানে এসেছে সব সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওর বউ বনানীকে। ওরা আমাদের কলকাতার বাড়িতেও অনেকবার গিয়েছে। খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। গোলমাল কিছু ছিল না। তৈরি হল। সূর্যকান্ত প্যারালাইজড হয়ে কলকাতায় ফিরে আসার পর। তখন বনানী আসতো একা। আসতো নানারকম দরকারে। বনানীকে তখন আর সহ্য করতে পারছিল না হেম। প্রতিদিন শুনতে হয়েছে, 'ও খারাপ হয়ে গেছে, ওকে আর বাড়তে দিও না, ও একদিন তোমার সর্বনাশ করে দেবে।' আমি প্রতিবাদ করেছি। কোনও কাজে লাগেনি। সূর্যকান্তর ছিল প্রচুর টাকা। হাত পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মাথাটা কাজ করছিল। ফুলের শখটাও মরে যায়নি। কি নিয়ে থাকবে বনানী? ওদের তো ছেলেমেয়ে ছিল না। বনানী এখানে আসতো ফুলের চারা নিতে। কথাটা হেমের কানে গিয়েছিল। আর ঠিক তখনই ওই ঘটনাটা ঘটে।'

'কি ঘটনা?'

অবনীশ কিছু বলতে পারে না।

'কি ঘটনা? মা চলে গেল?'

'না। আমার বাঁ হাতের আঙুলের ডগায় একটা ঘা হলো।'

'ঘা?'

'পাঁচটা আঙুলের মাথায় লালচে ঘা। নাকের দুপাশে বেরোতে থাকে অসংখ্য লাল লাল গুটি। একদিন হেম এল আমার সঙ্গে। এক স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে আমরা গেছি। এর কাছে সহজে পৌঁছানো যায় না। অন্তত দশদিন আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। হেমের সঙ্গে ডাক্তারের আলাপ ছিল। তিনি সেদিনই যেতে বললেন। কবে হয়েছে, কাকে দেখিয়েছি, কি কি ওষুধ লাগিয়েছি এসব জিজ্ঞেস করতে করতেই হঠাৎ তিনি হেমকে বললেন, তুমি একটু বাইরে যাও। হেম সুইংডোরের ওপাশে চলে যায়। আমি ওর পা দুটো দেখতে পাচ্ছিলাম। ডাক্তার আমাকে বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব কিছু মনে করবেন না। বললাম, না। ডাক্তার বললেন, তেমন কোনও মহিলার সঙ্গে কি আপনার কোনও সম্পর্ক হয়েছে, মানে সেক্সুয়াল রিলেশান, যেখান থেকে এরকম একটা অসুখ হতেও পারে? কি উত্তর দিয়েছিলাম

আজ আর মনে নেই। সারা রাস্তা ও আমার সঙ্গে একটাও কথা বলল না। পরদিন খুব বেলায় ঘুম ভেঙেছে। উঠে দেখি, তোকে নিয়ে হেম চলে গেছে। আর কিছু বোধহয় তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে না?'

'আর আসেনি মা?'

'এসেছিল, দু তিনবার আরও এসেছিল। সে তো ওর জিনিস নেবার জন্যে।'

বেলা পড়ে আসে। এখন পিতা ও কন্যা দুজনের মুখোমুখি নেমে আসে শেষ বেলার আলো। বিচ্ছেদের রং মাখা পড়ন্ত বিকেল এখন নীরব বেদনায় ম্লান।

'কাল সন্ধেবেলা মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে মা পুরস্কার নেবে। মা তোমাকে যেতে বলেছে।'

'কোথায়?'

'রবীন্দ্রসদনে।'

'আমি তো যেতে পারব না মা। ...এই বাগানে যে পোকাটা কামড়ে আমার হাতে ঘা করে দিয়েছিল, একটু আগে ওই পোকাটাই বোধহয় আবার কামড়েছে' অবনীশ হাতটা বাড়িয়ে দেয় মেয়ের দিকে, 'দ্যাখ তো মা হাতটা লাল হয়ে গেছে না?'

সুহাসিনী নিজের হাতের ওপর বাবার হাতটা মেলে ধরে।

অবনীশ দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায়, পাঁচটা তেইশ, মেয়েকে বলে, 'ছটা পাঁচে একটা ট্রেন আছে, চল তোকে স্টেশনে দিয়ে আসি।' দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ঘরের চারপাশ জুড়ে বাগান। সামনে ফুলের চারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকে সুহাসিনী, ফুলের চারায় আলোর রং তখন নদীর জলের মতো সরে যাচ্ছে।

মৃৎশিল্পী পরেশ পাল

[চার বছর আগে একদিন]

'স্যার, উনি বলছেন উনি কিছুই জানেন না।'

'এই খবরটা আনার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছি?'

'কি করব স্যার?'

'ধরে নিয়ে আসবেন, প্যাঁদাবেন।'

'অতো নামকরা লোক!'

'পালের বাচচা, তার আবার নাম।'

'আপনি ছাড়া স্যার কথা বেরোবে না।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। আপনারা সব মানুষ, আর জানোয়ার তো আমি একাই। যতো পাপ এই রঞ্জন দত্তই করবে, কেমন? কি, চুপ করে আছেন কেন, কথা বলুন।'

'আপনি তো স্যার মারধোর না করেও কথা আদায় করেছেন।'

'না তো। সেরকম কিছু তো আমার মনে পড়ে না, মারধোর না করে...এ লাইনটা আপনার মাথায় ঢুকল কি করে?'

'এটা একটু অন্যরকম কেস বলেই বলছিলাম স্যার।'

'অন্যরকমের কিছু নেই। আচ্ছা মহালয়া তো পরশু দিন, তাই না।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ঠিক আছে, তার আগেই কথা বেরোবে।'

[পরের দিন]

কিছু কিছু প্রতিমার রঙের কাজে তখনও বাকি। যে সব প্রতিমা দূরে দূরে যাবে সেগুলোর কাজ শেষ। শুধু তো কলকাতা নয়, বর্দ্ধমান, বীরভূম, দুর্গাপুর অনেক দূর দূর জায়গায় এখান থেকে প্রতিমা যায়। পরপর সেরকম বারোটি প্রতিমা। অন্যদিকে একটা উঁচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে পরেশ পাল একটা প্রতিমার চোখ আঁকছিলেন। হঠাৎ রঞ্জন দত্তর গলা শুনে পরেশ পালের হাতের তুলিটা বেঁকে যায়। তুলির মাথায় ঘন কালো রংটা দুর্গা প্রতিমার গাল ঘেঁসে দাগ বসিয়ে দেয়। পরেশবাবু নেমে আসেন।

'পরেশবাবু আপনার সঙ্গে কটা কথা ছিল।'

'বসুন'।

'বসার দরকার নেই। আপনি আমার কথার জবাব দিন।'

'বলুন।'

'আচ্ছা পরেশবাবু প্রত্যেকবারেই তো পুজোর আগে আপনি নানা জায়গা থেকে টাকা ধার করেন, তাই না?'

'হ্যাঁ করি, শোধও দিয়ে দি।'

'সে তো দেবেনই, আপনার এত নাম। আপনি তো আর টাকা মেরে ব্যবসা করতে পারেন না।'

'এসব কথা বলছেন কেন?'

'না, বলছিলাম এবার আপনি কতো টাকা ধার করেছেন?'

'হাজার কুড়ি হবে।'

'সে তো অনেক টাকা।'

'না করে উপায় কি বলুন। কতোগুলো লোক কাজ করছে দেখুন না।'

'এই পুরোটারই মালিক তো আপনি?'

'মালিক আমরা সবাই। ধারগুলো আমার নামে হয়, এই আর কি।'

'আপনার ছেলে সুবোধ কোথায়?'

এতক্ষণ যেসব কথা চলছিল সেসব কথা বলতে যে রঞ্জন দত্ত এখানে আসে নি পরেশবাবু তা জানতেন। জানতেন বলেই ভয়ে প্রতিমার মুখে তিনি কালি মাখিয়েছেন। তখনই বুঝেছেন একটা অঘটন আজ ঘটবেই। রঞ্জন দত্তর ভয়ে ততক্ষণে আশপাশের অন্য পটুয়ারা তাদের হাতে তুলি নিয়ে ত্রিপলের নীচে যে যার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'সুবোধ কোথায়?'

'আমি জানি না। ও তো অনেক দিন আগেই এখান থেকে চলে গেছে।'

'সে তো আমিও জানি, কিন্তু কোথায় গেছে?'

'আপনি তো জানেন, ও যেখানেই যাক আমাকে জানিয়ে যাবে না।'

'দেখুন পরেশবাবু, আমার কাছে এরকম খবর আছে যে আপনি জানেন সুবোধ কোথায় আছে।'

'যে আপনাকে এরকম খবর দিয়েছে সে আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছে।'

'কথা বাড়াবেন না পরেশবাবু। আমি একটা খুব ছোট্ট কথা জানতে চাইছি, আপনি খুব ছোট্ট করে জবাব দিন। সুবোধ কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'তোর বাপ জানে।'

'রঞ্জনবাবু আপনি আমাকে অপমান করলেও আমার কিছু করার নেই।'

'দেখুন পরেশবাবু আমি আপনাকে ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দেব। এর মধ্যে যদি আপনি না বলেন সুবোধ কোথায় আছে, আপনার এখানে সব কটা প্রতিমা আমি ভেঙে দিয়ে যাবো। কাল মহালয়া, এরপর আপনার বোধহয় কিছু করার থাকবে না। আমার ভাড়া করা লোকরা বাইরে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। আপনি ঠিক করুন বলবেন কি না। আমি ঘড়ি দেখছি। ঠিক পাঁচ মিনিট।'

রঞ্জন ঘড়ি দেখছেন।

পরেশবাবু জানেন তাঁর ছেলে সুবোধ এখন কোথায় আছে। খুব দূরে যেতে পারে নি, এখনও কাছাকাছি কোথাও আছে। সেখান থেকে বেরোতে পারছে না। কিন্তু মরে গেলেও রঞ্জন দত্তকে তিনি বলবেন না তাঁর ছেলে কোথায় আছে।

পরেশ পাল সারি সারি প্রতিমার দিকে তাকান। কি বলছে রঞ্জন দত্ত? লোকটার কি মাথা

খারাপ নাকি? ভাড়া করে লোক এনেছে রঞ্জন দত্ত? কিন্তু সত্যই কি প্রতিমাগুলি ভেঙে দেবার মতো সাহস ওদের আছে? না, না, অসম্ভব। ভয় নেই? অভিশাপ লাগবে না? টাকার জন্য কেউ মূর্তি ভাঙতে পারে? টাকা দিয়ে কি সব হয়? রঞ্জন দত্ত তুমি যত বদমাইশ হও তুমি মানুষ চেনো না। মানুষের সাহসেরও একটা মাত্রা আছে। যাদের তুমি ভাড়া করে এনেছো তারা পরেশ পালের প্রতিমার সামনে কতোবার ভক্তি ভরে প্রণাম করেছে তুমি জানো না।

কতো দিনের পরিশ্রমে, কতো রাত্রির জাগরণে, কতো ধ্যানে, কতো আশায়, কতো যত্নে এই মূর্তি তিনি গড়ে তুলেছেন। পরেশ পাল সেই মূর্তিগুলির দিকে চেয়ে দ্যাখেন : 'এই মা যা-হইবেন। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত, দিগ্‌ভূজা নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র পৃষ্ঠাবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী-—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, বামে কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।' [আনন্দমঠ, একাদশ পরিচ্ছেদ]।

ঠিক ঠিক পাঁচ মিনিট পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জন দত্ত বাইরে বেরিয়ে আসেন। জনা দশ বারো ছেলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। তাদের প্রত্যেকের হাতে লম্বা লম্বা লোহার ডাণ্ডা, নানারকম ভাঙচুরের অস্ত্র, শুরু হয় তাদের তাণ্ডব।

একটার পর একটা মূর্তি তারা ভাঙতে শুরু করে। খসে পড়তে থাকে জ্যোতির্ময়ী দশভুজার হাত, মুখ, পা, বুক, শঙ্খ. চক্র, ত্রিশূল, ভেঙে পড়তে থাকে মহিষ অসুর সিংহ ময়ুর হাঁস প্যাঁচা লক্ষী সরস্বতী কার্তিক গণেশ। নিরস্ত্র পরেশ পাল এবং তাঁর সঙ্গী সহকর্মী পটুয়ারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ওপর। কিন্তু কি করে পারবে তাদের সঙ্গে যারা আগে থেকেই তৈরি হয়ে এসেছে। রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে সবাই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান পরেশ পাল। রঙের বাটির ওপর রক্তে আর রঙে মাখামাখি হয়ে ভাঙা মূর্তিগুলোর সঙ্গে পটুয়ারা পড়ে থাকে। দেবীমূর্তির অলঙ্কার অস্ত্রশস্ত্র ভাঙা মুকুটগুলো হাতে হাতে উল্লাস করতে করতে বীরদর্পে সেই ভাড়াটে গুণ্ডারা বেরিয়ে যায়।

[চার বছর পরে একদিন]

'আপনাকে করতেই হবে।'

'না আমি পারবো না।'

'কেন পারবেন না?'

'তোমরা দেখো আমি পারবো না, কিছুতেই পারবো না।'

'শুনুন পরেশদা, আপনি এবার প্রতিমা না বানালে আমরা পুজোই করব না।'

'কি বলছো রবি, এবার তোমাদের রজত জয়ন্তী...'

'সেজন্যেই তো বলছি। আমাদের ক্লাবের প্রথম বছর থেকে আপনি প্রতিমা গড়ছেন। কুড়ি বছর একটানা আমাদের প্রতিমা বানিয়েছেন। আপনি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে এ বছর আমরা ঠাকুর বানাবো না।'

'গত চার বছর তো আমি কোনও মূর্তি বানাইনি।'

'গত চার বছরের কথা ভুলে যান পরেশদা।'

'কি করে ভুলব শ্যামল, তুমি হলে কি ভুলতে পারতে?'

'আমরা তো আপনাকে ভুলিনি পরেশদা।'

'না, তা ঠিক, তোমরা ভোলো নি, তোমরা ভোলোনি বলেই তো আমি এখনও বেঁচে আছি।'

মিত্রসঙ্ঘর কর্মকর্তারা পরেশ পালের ঘরে একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত মিত্রসঙ্ঘর দুর্গোৎসব দেখতে দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। আসে পরেশ পালের ঠাকুর দেখতে। মিত্রসঙ্ঘ'র সকলেই ছেলেবুড়ো সবাই পরেশবাবুকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। তাদের এত নামের পেছনে কৃতিত্ব সবটাই পরেশ পালের। সেই পরেশ পাল গত চার বছর তাদের দুর্গাঠাকুর বানাতে পারে নি। কিন্তু এবার তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরেশ পালকে দিয়ে তারা প্রতিমা বানাবেই। তাই সকলে মিলে চেষ্টা করছে তাকে রাজি করাতে। পরেশবাবু রাজি হচ্ছেন না। তাঁর হাত কাঁপে, তাঁর শরীর কেমন করতে থাকে। তাঁর ভয় হাতের আঙুল বেয়ে চোখে মুখে মাথায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর ব্যবসার সঙ্গীরা প্রায় সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। কারণ পরের বছর তিনি নিজেই অনেকগুলো মূর্তি নষ্ট করেছেন। অন্যরা তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে মূর্তির মুখ বং করেছে, চোখ এঁকেছে, ঠোঁট এঁকেছে, তারপর একে একে সবাই ঘুমোতে গেছে। সূর্য ওঠাব মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেছে পরেশবাবুর। তিনি উঠে বসেছেন, বসে দেখেছেন প্রতিমার মুখ। সেই মুখে রোদ্দুর লাগছে। হাতেব কাছেই ছিল অনেকগুলো রঙের বাটি। এক এক বাটি লাল নীল সবুজ রং তিনি ছুঁড়ে মেরেছেন প্রতিমার মুখে। ভাগ্যিস ঠিক তক্ষুনি একজন, জেগে ওঠে। সে পবেশবাবুর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে রঙের বাটি। একে একে অন্যরাও জেগে উঠে বাধা দেয়। আর সেদিনই সবাই বুঝে গেছে পরেশ পালের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে ঋণে ঋণে জর্জরিত পরেশ পাল।

মিত্রসঙ্ঘ এই চার বছরই পরেশবাবুকে কিছু টাকা সাহায্য করে এসেছে। মিত্রসঙ্ঘর কাছে তাই তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু কেবল কিছু টাকাই পেয়েছেন, যদিও সেটা পেয়েছেন বলেই মাঝে মধ্যে ভাত জোটে এটা পরেশবাবু ভালোই জানেন। কিন্তু শুধু টাকা কেন? কেন ওই ঘটনার কেউ প্রতিবাদ করল না? একটা ছেলেকেও কেউ ধরে আনল না? তাঁর ছেলে সুবোধকে যদি দিন দুপুরে সকলের চোখের সামনে গুলি করে মারা হয় রঞ্জন দত্তই বা বেঁচে থাকে কেন?

তবু, মিত্রসঙ্ঘ যে তাঁর জন্যে অনেক করেছে সেটা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। এতদিনে তো ভিখিরি হয়ে যাওযার কথা তাঁর। ভিক্ষে তো করেন না। একটু আগে শ্যামল ওই কথাটা মনে করিয়ে দিলো, 'আমরা তো আপনাকে ভুলিনি পরেশদা।' ঠিক, ঠিকই তো বলেছে শ্যামল।

ক্লাবের সম্পাদক অশোক মৈত্র একটা ইন্ডিয়া কিং এগিয়ে দিলেন পরেশবাবুর দিকে, পরেশবাবু সিগারেটটা ধরালেন। কেউ কোনও কথা বলছে না। সিগারেটের ধোঁয়া ঘুরছিল ঘরের মধ্যে। অশোক মৈত্র নীরবতা ভাঙলেন 'পরেশবাবু আমরা ঠিক করেছিলাম আমরা এবার আপনাকে দশ হাজার টাকা দেবো। টাকাটা বোধহয় আপনার খুব দরকাব, তাই না?' পরেশবাবু এরকম একটা কথার জন্যে তৈরি ছিলেন না। একটু অবাক হ'য়ে তিনি বলেন, 'টাকা যে আমার কী ভীষণ দরকার সে তো আপনাদের চেয়ে ভালো কেউ জানে না।...অশোকবাবু এবার আপনাদের রজত জয়ন্তী, আপনারা আমাকে একটা টাকা দিলেও আমি মূর্তি গড়ে দিতাম। আমি তো টাকার কথা বলছি না। আমি বলছি আমি মাটিতে হাত দিতে পারবো না। আমি রং তুলিতে হাত ছোঁয়াতে পারবো না, শেষ মুহূর্তে যদি আমি আপনাদের ডুবিয়ে দি?' অশোক

মৈত্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, 'তাহলেও আপনি দশ হাজার টাকা পাবেন।' মুহূর্তের মধ্যে চিৎকার করে ওঠেন পরেশ পাল, 'আমাকে বেশ্যা পেয়েছেন? তখন থেকে আপনি টাকা টাকা করছেন? ভিখিরির বাচ্চা আমি? আপনারা আমাকে ভিক্ষে দিতে এসেছেন? লোভ দেখাচ্ছেন? আর আমার ছেলেটাকে যখন গুলি করে মারছিল তখন আপনারা সব জানলা আটকে ঘরের মধ্যে বসেছিলেন, এখন আমাকে ভিক্ষে দিতে এসেছেন। যান বেরিয়ে যান, এক্ষুনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যান...।'

মিত্রসঙ্ঘর কেউ কোনও প্রতিবাদ করে না। কেউ কোনও কথা বলে না। চুপচাপ ধীরে ধীরে একে একে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

'যাক বাঁচা গেলো।'

'কেন বাঁচা গেলো কেন?'

'পরেশদা যদি একবার রাজি হোয়ে যেতো কি বিপদ হতো বলুন তো।'

'বাঃ চমৎকার। একটু আগে লোকটাকে হাতে পায়ে ধরে রাজি করাচ্ছিলে আর এখন বলছো বাঁচা গেলো।'

'পাগলামিটা যে আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে কে জানতো?'

'কেন পরেশ পালের মাথা আবার ঠিক হোয়ে গেছে এ খবরটা তোমায় কে দিল?'

'তা নয়। মাঝে মধ্যে তো ভালোই থাকে।'

[পরের দিন]

পরদিন সকালে অশোক মৈত্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন পরেশ পাল। অত্যন্ত নম্র বিনীত স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলেন, 'কাল আমি আপনাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি অশোকবাবু। আসলে কি জানেন, হঠাৎ সুবোধের মুখটা মনে পড়ল। মাথাটা কিরকম গণ্ডগোল হয়ে যায়। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি অশোকবাবু। আপনারা আমার অনেক উপকার করেছেন। আমি অকৃতজ্ঞ। আমি দিন দিন একটা পশু হয়ে যাচ্ছি অশোকবাবু, আপনারা আমায় ক্ষমা করে দিন...'

অশোকবাবু বলেন, 'আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না পরেশবাবু। আমরা সব জানি। আমরাও তো আপনাকে জোর করে ঠিক করিনি।'

'না, না, ঠিক করেছেন, খুব ঠিক করেছেন, একটা কথা বলব অশোকবাবু?'

'বলুন।'

'প্রতিমাটা আমায় করতে দিন, আমি পারবো।'

অশোকবাবু বলেন, 'আপনি একটু বসুন। আমি একটা ফোন করে আসছি।' অশোকবাবু ঘর থেকে উঠে যান। ঘরের দেয়ালে একটা দুর্গা প্রতিমার বাঁধানো ফোটো। খুব যত্নে বাঁধানো সেই ফোটোর দিকে চেয়ে পরেশবাবুর মনে পড়ে, এটা কয়েক বছর আগের মিত্রসঙ্ঘর দুর্গাপ্রতিমা। নন্দলাল বসুর আঁকা একটা ছবি থেকে এই প্রতিমা তিনি বানিয়েছিলেন। ফোটোটা আরও কাছ থেকে দেখবেন বলে চেয়ার থেকে উঠে আসেন পরেশবাবু। ফোটোর কাছে এসে সেই মুখের দিকে চেয়ে তিনি ভাবছেন, পারবো তো? পারবো তো মূর্তিটা গড়তে? পরেশ পাল নিজের হাত দুটোর দিকে একবার চেয়ে দেখেন, মনে হয় দশটা আঙুল যেন ভয় পাচ্ছে, আঙুলগুলো ভয় পাওয়া শিশুর মতো তাঁর মুখের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে আছে।

দালাল

'মনে রেখো এই খালে তোমার লাশ আমি পচিয়ে দেবো।'

যেন জটার নিশ্বাসের দুর্গন্ধ এসে লাগছে গগনের মুখে। কী বেপরোয়া এই ছেলেটা, কী দাপটেই না ঘুরে বেড়াতো। সারা এলাকা ওর ভয়ে তটস্থ। ওর নাম জটা মাস্তান। কে না শিউরে ওঠে ওই নামে। গগন তার বিছানা ছেড়ে উঠে আসে, টর্চ জ্বালিয়ে কৌটো থেকে একটু চই বার করে মুখে নিয়ে চিবোতে থাকে। ঘুম আসে না।

এই জটা কালীপুজোর পর তার গগনদাকে পার্ক স্ট্রিটে খাওয়াতে চেয়েছিল। গগন রাজি হলো না। বড় ব্যবসায়ী আর ছোট দোকানদার, এম এল এ আর পার্টির লিডার যেই হোক না কেন, সবাই যাকে খুশি রাখে, বড়রকম চুরি হয়ে গেলে পাতাল-রেলের কনট্রাক্টার-ইঞ্জিনিয়াররা যার সঙ্গে গোপন বৈঠক করে, যাকে গত কয়েক বছরে পুলিশ যে কবার ধরেছে তার চেয়ে অনেক বেশিবার ছেড়ে দিয়েছে, সেই জটা দত্ত যখন ভরপেট খাওয়াতে চেয়েছে, তখন মারাত্মক ক্ষুধায় লোভী হয়ে উঠেছিল গগন সরকার, শেষ পর্যন্ত যায়নি। গগন মনে মনে শক্ত হয়েছে, দালাল বলে কি সে মাস্তানের দালাল?

জটা অবশ্য তাকে দালালি করার জন্যে ডাকেনি। সে জানে, গগনের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়েছে। কাজকর্ম কিচ্ছু নেই তার বহুদিন। কালীপুজোর সময় এত চাঁদা ওঠে, স্যুভেনিরে এত বিজ্ঞাপন পায় যে, লাইট-প্যান্ডেল প্রতিমায় প্রচুর টাকা খরচ করে বড় বড় শিল্পীদের দিয়ে ফাংশান করে, গুণীজন সংবর্ধনা দিয়ে আরও কয়েক হাজার টাকা থেকে যায়। অতো খাটাখাটনির পর তার ছেলেরা তো একটু ফুর্তি করতে চাইবেই, জটা তাদের বঞ্চিত করবে কেন? তাই সে তার দলবল নিয়ে একদিন খেতে যায়, পার্ক স্ট্রিটে মিস গুলাবীর উদোম নাচের সামনে মালের পাগলা-ঝোরা বইয়ে দেয়।

তার দলে সে শুধু গগনদার একটু চরণধুলি চেয়েছিল। পায়নি ব'লে তার কোনও আপশোশ নেই। দুদিন পরে গগনদার ঘরে এসে সে বলে গিয়েছিল, 'গুরু, তোমার মাইরি ক্যারেকটার আছে, এ তল্লাটে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি রেসপেক্ট করি না।' ঠিকই বলেছে জটা। রাতবিরেতে জটা তার চোরাই মাল অনেকের কাছেই জমা রেখেছে, সেই মাল রাখতে গিয়ে পুলিশের কাছে কম লোক তো ধরা পড়েনি। জটা বেইমানি করে না, জটা তাদের ছাড়িয়েও এনেছে, কিন্তু সে কোনওদিন গগনের ঘরে কোনও বেআইনী মাল রাখতে সাহস করেনি।

আশপাশের ঘর থেকে সস্তা মাছের বাদশাহী গন্ধ আসে। কড়া কড়া মশলা দিয়ে রাঁধা চিংড়ি পুঁটি ল্যাটা তেলাপিয়া সব ঝাঁঝালো গন্ধ মিলেমিশে বেঁচে থাকতে ভালোই লাগছিল। মনে হচ্ছিল চারপাশে মানুষ জিব দিয়ে জীবনের নুন-ঝাল চেটেপুটে এঁটো শালপাতায় ফেলে দিচ্ছে জীবনের দুঃখকষ্ট। গগন সরকার মাছ কিনতে পারে না। একসময় জবা ফুলের মতো টকটকে রক্ত লেগে থাকা মাছের মাথাগুলোর কাছে গগন ঘুরঘুর করতো। তারপর জয়কালী বলে একটা কিনেই ফেলত। ছোটবেলা থেকেই প্রিয় তার মুড়িঘণ্ট। কিছুদিন আগেও বেশ তরিবৎ করে

সে এটা রান্না করেছে। আদা লঙ্কা রসুন আর গরমমশলার খোশবুতে এই ভাঙাচোরা ঘরটারই তখন কতো ইজ্জত বেড়ে যেত। ভালো রান্না হলে নিজেকে কতো দিলদরিয়া মনে হয়। আজ কতোকাল সে মুড়িঘণ্ট খায়নি। কোত্থেকে কিনবে সে মাছের মাথা?

উত্তর কলকাতার এ অঞ্চলটাতে এ বাড়ির এ ঘরটাতে সে রয়েছে আটত্রিশ বছর। এখানকার ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি গরিব বড়লোক মালিক শ্রমিক পাকাবাড়ি বস্তিবাড়ি সব বাড়ির প্রায় সকলেই ওকে চেনে। কলকাতার বহু প্রাচীন এলাকা। একসময় কী দরিদ্র হতশ্রী চেহারা ছিল। এখন এই এলাকারই একটা দিক, যে দিকটা শহরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, সেখানে লোকজনের হাতে অনেক পয়সা এসেছে। মনিহারী দোকান বাহারী জিনিসে ভরে গেছে। কতোরকম যে সাবান আর শ্যাম্পু বেরিয়েছে। রেডিও, স্টিরিও, টু-ইন-ওয়ান, ফ্রিজ, আলমারি আর টিভির ঝলমলে দোকান হয়েছে। পানের দোকানে কতোবড় আয়না বসেছে। সুবোধ হালদার তার লটারি টিকিটের দোকানটা ফুলের মালা দিয়ে মুড়িয়ে রাখে। ফণি মল্লিকের ছেলে নিতাই ক্যাসেটের দোকান করেছে, গান কমিক যাত্রা যখন যা খুশি বাজিয়ে কানের পাপড়ি ফাটিয়ে দিচ্ছে।

গগন সরকারের দেশ পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি। কলকাতায় ক্যানিং হস্টেলে থেকে দু বছর বঙ্গবাসীতে ইন্টারমিডিয়েট পড়েছিল। চাকরি পেয়ে গেল হিন্দুস্তান মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কে। বড় সাহেবের যে লোক ছিল তার চাকরি হয়নি। সাহেব ওর নামে কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যে রিপোর্ট দিল। লড়াই করার জন্যে সে প্রস্তুত হয়েছিল। তখনই সারা নোয়াখালি জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছে। পিতৃপিতামহের ভিটে ছেড়ে যে যেদিকে পারছে পালিয়ে যাচ্ছে। রোজ রাত্তিরে গগন অপেক্ষা করে থাকে আজই হয়তো এসে পড়বে তার বাবা মা আর ছোট ভাই দেবু। কিন্তু না, কেউ এলো না।

চাকরিটাও খোয়াতে হলো।

দেখল বাড়ি জমি এসব খুঁজে দিলে টাকাপয়সা মন্দ আসে না। গগন সরকার দালাল হয়ে গেল। একসময় লোকজনকে বাড়ি খুঁজে দিত, জমি কিনে দিত, গাড়ি কিনে দিত, এমনকি মাল বিক্রির দালালিও করত। টাকাপয়সা তাতে খারাপ আসেনি। মাঝে মাঝে দু-চার মাস কষ্ট হয়েছে। আবার এমন একখানা বাড়ি কিংবা জমির খবর এনে দিয়েছে, এমন কিছু পুরোনো আসবাব বেচে দিয়েছে, তিন মাস একেবারে ফুরফুর করে, ভালো খেয়েদেয়ে, শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার দেখে এর ওর বিয়েতে উপনয়নে সাহায্য করে, কারও ইস্কুলে মাইনে দিয়ে, কারও পরীক্ষার ফিজ দিয়ে, কাউকে চশমা করে দিয়ে একরকম ছোটখাট নবাবির ভেতর দিয়ে তিন মাস কখনও তিন সপ্তায় কেটে গেছে, গিলে করা পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে ফিনফিনে দিন উড়ে গেছে।

হেমেন্দ্রনাথ স্মৃতি সাধারণ পাঠাগারের বইয়ের আলমারির কাচগুলোতে মহাকালের ধুলো জমতে জমতে ভেতরের বইগুলোকে প্রাচীন পুথির মতো দেখায়। কেউ আর আগের মতো যায় না ওই লাইব্রেরিতে। কেনই বা যাবে? ওসব পুরোনো বই কে আর পড়ে এখন? নিয়মিত যায় শুধু লোকেশ মণ্ডলের মেয়ে ঝিল্লি। একদিকে জীবনটা নিশিকান্ত ডাক্তারের মতো বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, আর একদিকে ঝিল্লির মতো ষোলো সতের বছরের একটা মেয়ে জীবনটাকে দিঘির মতো শান্ত ঠাণ্ডা মায়াবী করে রেখেছে।

জানুয়ারির ২৩ তারিখ, তারিখটা বিখ্যাত বলেই মনে আছে, অনেক রাতে দরজায় শব্দ

শুনে, উঠে আসতে ভয় করছিল গগনের। কোনওদিন কোনও কিছুতে সে ভয় পায়নি। দরজাটা খুলতেই হলো। চাদরের নিচে হু হু করে কাঁপছে জটা। কয়েকটা দিন কলকাতায় কী শীতটাই না পড়েছিল। এত রাতে জটা এখানে?

'ভোর হবার আগেই চলে যাবো আর কিছু জানতে চেয়ো না।'

অন্য খাটটার ওপর এসে শুয়ে পড়ে জটা। চাদরের তলা থেকে কোনওরকমে একবার মুখটা বার করে বলে, 'আর কম্বল নেই?'

গগন উত্তর দেয়, 'না একটা কাঁথা আছে।' বোবার মতো আওয়াজ বেরোয় জটার মুখ থেকে। কম্বলের ওপর কাঁথাটা বিছিয়ে দেয় গগন। জটা উঠে বসে। কাঁথা দিয়ে সারা শরীরটা জড়িয়ে ওপরে কম্বলটা রাখে। দেশ থেকে আসার সময় ঠাকুম্মা এই কাঁথাটা বানিয়ে দিয়েছিল। ক্যানিং হস্টেলে শুভময় বলত, 'কি ছার ইহার কাছে ঢাকাই মসলিন?'

দু'দিন পরে কাগজে একটা খবর দেখে সে চমকে ওঠে। সোনাগাছিতে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে এক পতিতা নিজের ঘরে ছুরিকাঘাতে নিহত। গত চারদিন এই এলাকা অন্ধকারে ডুবে আছে। পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ভোর হবার আগেই চলে গিয়েছে জটা।

কাঁথায় রক্ত লেগেছিল। বহু মূল্য কাশ্মীরী শালের মতো এই কাঁথা গগন এতকাল যত্ন করে রেখেছে। কাঁথাটা সে ফেলে দিল। সেই যে গিয়েছে তারপর এই ছ'মাস এ-এলাকায় জটাকে কেউ কখনও আর দেখেনি। থানার নতুন বড়বাবু জীবন মহাপাত্র বেশ কিছু ছেলেকে ধরে এনেছিল, কারও কাছ থেকে জটার কোনও হদিশ পায়নি। গগন শুনেছিল মহাপাত্র নাকি এমন কথাও বলেছে, যতদিন এই থানায় আমি আছি এ এলাকায় জটার মুখ কাউকে দেখতে হবে না, দেখলে শুধু আমিই দেখব।

জীবন মহাপাত্র বদলি হয়ে গেল। তার মতো লোক বেশিদিন এক জায়গায় থাকতে পারে না। সে কি এটা জানতো? আর একটু ধীরেসুস্থে কি কাজ করা যেত না? হয়তো যায় না।

'শোনো গগনদা, আমি এসছি শুধু ঝিল্লির জন্যে।'

'তার মানে?'

'ও মেয়েটাকে আমার চাই।'

'কি বলছো তুমি?'

'এত চমকাচ্ছো কেন? ও মেয়েটাকে আমার চাই।'

'চাই তো ওর বাবাকে বলো।'

'ন্যাকামো কোরো না, ও হারামি না খেয়ে মরবে তবু জটাকে মেয়ে দেবে না, জটা তো মাস্তান।'

'তাহলে?'

'উপায় আছে।'

'কি উপায়?'

'আমি ওকে তুলেই নেব কিন্তু লোকে জানবে ও আমার সঙ্গে পালিয়ে গেছে।'

এক কিলোমিটার দূরে মোহনপুর খালের ওপর নতুন ব্রিজ হয়েছে। অথচ এ দিকটা এখনও আগের মতোই অন্ধকার। প্রায়ই এ খালপাড় দিয়ে যাবার পথে খাদ্য আন্দোলনের দিনগুলোর মতো মনে হয় এদিকটাকে। অথচ এখানকারই আর একটা দিকে ল্যাম্পপোস্টগুলো যত উঁচু হচ্ছে আলোর জোর ততো বেড়ে যাচ্ছে, কতো ব্যাঙ্ক, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ওষুধের দোকান,

আইসক্রীম, কোল্ড ড্রিংকস, খাদি গ্রামোদ্যোগ, বিদেশী ব্যাগ, ছাতা, পারফিউম, লাইটার, সান-গ্লাস, চীনে খাবার, কতো কি?

'গগনদা শোনো, পরশু সোমবার রায়সাহেবের মাঠে 'নাটমন্দির'-এর যাত্রা হচ্ছে। তুমি ঝিল্লিকে যাত্রা দেখানোর নাম করে এ রাস্তাটা ধরবে। ওদের বাড়ি থেকে এটাই সোজা রাস্তা। কেউ সন্দেহ করবে না। তাছাড়া তুমি নিয়ে যাচ্ছো। তুমি শালা ওর বাপের চেয়েও বেশি। ওদের বাড়ি থেকে বেরোবে ঠিক সাড়ে সাতটায়। মিনিট পনের লাগবে এখানে আসতে। ওই যে মিনিবাসটা কেলিয়ে পড়ে আছে, ওই মিনিবাসটার পাশে একটা কালো গাড়িতে আমি বসে থাকব। বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

মিনিবাসের ভাঙাচোরা স্টিয়ারিংটাব ওপর শ্রাবণের এক টুকরো জ্যোৎস্না উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

'পরদিন সকালে সবাই জানবে ও আমার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। ফাংশানের সময় জটাদার গা-ঘেঁষে ছবি কম তোলেনি। গুণীজনদের মানপত্র লিখেছিল কে? কে পাঠ করেছে? অজয়, পরাগ, শম্ভু ওরা সব ছবিগুলো দেখাবে ওর বাপকে। কালার ছবি। একটা ছবিতে দেখবে মালা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, শুভদৃষ্টি শালা আমি নিজেই করে নেব, করাতে হবে না। ওসব ছবি দেখলেই লোকে বলবে, ঢলাঢলি তো কম করেনি।'

'মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে বলে কিছু হয় না গগনদা, সবই সত্যি। এই যে তোমার আজকাল দালালি জোটে না, এটা কি মিথ্যে? এই যে তোমাকে একটা দালালি জুটিয়ে দিলাম, এটাই সত্যি। আমি তোমাকে নগদ এক হাজার টাকা দেব। এখন নয়, সোমবার, পৌনে আটটা,...তক্ষুনি, হাতে হাতে।'

'কি বলছো তুমি? তোমাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'এখন আর খুঁজছে না। মহাপাত্র বদলি হয়ে গেছে। তাছাড়া খুঁজলেই কি এত সহজে জটা মাস্তানকে পাওয়া যায়? বর্ধমান, বাঁকুড়া দরকার হলে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি...দেশে কি জায়গার অভাব আছে?'

'তোমার হাতে খুনের রক্ত লেগে আছে আর তোমার হাতে আমি ঝিল্লিকে তুলে দেব?'

'দেবে। ওকে আমি সুখে রাখব, খেতে দেব, পরতে দেব, গয়না দেব!'

'তারপর বেচে দেব।'

মুহূর্তের মধ্যে এগিয়ে এসে গগনের বুকের ওপর জামাটা টেনে ধরে জটা।

'গগনদা, মুখ সামলে কথা বলো। আমার মাথায় রক্ত চড়িও না। এক হাজার টাকাটা খুব কম নয়। তুমি শালা খেতে পাও না। সোমবার রাত পৌনে আটটা...মনে রেখো, ঝিল্লিকে যদি না পাই, এই খালে তোমার লাশ আমি পচিয়ে দেব।'

ডাফ্ স্ট্রিটে ঝিল্লির বাবা একটা প্রেসে কাজ করে। বড় প্রেস। রোজই ওভারটাইম পেত। সে প্রেসে আজ দু বছর ধরে গোলমাল চলছে। ওভারটাইম তো দূরের কথা, মাসের মধ্যে দশ-বারো দিন কোনও কাজই থাকে না। কার্তিকবাবু দুটো বড় মেশিন তো বেচেই দিয়েছেন। নতুন কাজ এখন কোথায় পাবে লোকেশ? চারটি ছেলেমেয়ে। ঝিল্লিই বড়। খালপাড়ে দুটো ঘর নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। সারাদিন মেশিনের শব্দের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে বলেই লোকেশ এত চুপচাপ।

মেয়েটা পেয়েছে বাপের স্বভাব। এই মেয়ে তিনটে বছর কি কম জ্বালিয়েছে? সব টাকা দিয়েছে তখন এই গগন সরকার। হাসপাতাল, কবিরাজ, ডাক্তার, বারাসাতের সাধুবাবা, কি না করেছে, কোথায় না গেছে এই মেয়েকে নিয়ে। সেই মেয়ে এবার মাধ্যমিক পাশ করেছে। সেদিন বাড়ির সবাই মিলে নিতাই মাঝির বড় বড় জিলিপি খাওয়া হলো।

নিশিকান্ত ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে ফিরে আসে গগন।

গগনের দালালি জোটে না, নিশিকান্তরও রুগী জোটে না। হোমিওপ্যাথির ওপর তো আজকাল লোকের বিশ্বাস কতো বেড়ে গেছে। কিন্তু কেউ আসে না আশি-পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ এই ডাক্তারের কাছে। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এখন জগতের কঠিনতম রোগেরও চিকিৎসা করে, আর শীত, গ্রীষ্ম সারা বছর কালো প্যান্টের ওপর কালো কোট পরে একটা চেয়ারে আগের দিনের বাসি খবরের কাগজটা মুখের ওপর নিয়ে বসে থাকে নিশিকান্ত। কাগজটা দেয় পাশের দোকান থেকে হরেন দর্জি। গগন জানে, একদিন এই খবরের কাগজের নীচে মরে পড়ে থাকবে এই লোকটা। তার আগে কি খালের জলে পচে যাবে তার নিজের লাশ?

একসময় কলকাতায় কতো রাস্তাঘাট চিনতো সে। বেহালা যাদবপুর কসবা উল্টোডাঙা জোড়াবাগান কাশীপুর কলকাতার এ প্রান্ত ও প্রান্তে কোথায় কোন জমি বিক্রি হচ্ছে, পুকুর বিক্রি হচ্ছে, ঘর ভাড়া দিচ্ছে, বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, দোকান উঠে যাচ্ছে, কারখানা বসছে, সব ছিল তার নখের ডগায়। একসময় বাড়ির গিন্নি এসে মাথার ওপর ফ্যান খুলে দিত, পান চিবিয়ে চিবিয়ে বলত, 'দ্যাখো বাবা, ভাড়া আমরা বেশি চাই না, ভদ্রলোক হলেই হবে, সব তো সেপারেট, বাড়িটা যাতে নষ্ট না করে।' আর এখন? বাড়ির বউ তো দালালের সঙ্গে কথা বলে না, ভেতরের ঘর থেকে সেন্টের গন্ধ আসে, বউমার গলা শোনা যায়, 'বলে দাও আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেব...কোত্থেকে যে খবর পায়...জামাইবাবু কিন্তু বেরিয়ে যাবে...তোমার তো কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই... তোমার আবার বেশি ভদ্রতা, চা...চা এখন বানাবেটা কে...দালাল ফালালের সঙ্গে এত কথা কিসের...তাড়াতে পারো না...সকালে উঠে দালালের মুখ দেখেছ...আজ দিনটাই মাটি হবে।' ঘর বাড়ি জমি পুকুর এসবের জন্য লোকে আজকাল দালালের পেছনে আর আগের মতো ঘোরাফেরা করে না। বাড়ির দালালরা এখন অন্য কিছুর দালালি করে, নাকি দক্ষিণে এখনও দালাল আছে, গগন তো অনেক কিছুরই দালালি করেছে, এখন তো কিছুই জোটে না। এখন দালালের মুখ দেখলে দিনটাই মাটি।

কথা ছিল পরের দিন রাত দশটার সময় আবার আসবে জটা। গগন সরকার তার জন্যে অপেক্ষা করে। জটা যখন আসে তখন দশটা বেজে পঁয়তিরিশ।

'দেরি করে এলাম তো ইচ্ছে করে, দেখছিলাম তুমি পালাও কিনা। গেছিলে?'

'কোথায়?'

'কোথায় জানে না? ...ও যাচ্ছে তোমার সঙ্গে?'

'যাচ্ছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ গগনদা। টাকাটা কালই হাতে হাতে পেয়ে যাবে, তক্ষুনি। আমি জানি তোমার কোনও কাজ নেই। লাইনটা ছাড়ো গগনদা, আমাদের লাইনে চলে এসো। এটাও দালালি। তোমার বয়েস হয়েছে। অতো হাঁটাহাঁটি কি ভালো?'

'আচ্ছা জটা, কিছু যদি মনে না করো, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'করো।'

'তোমার ভয় করে না?'

'কিসের ভয়?'

'তুমি বিষ্ণুপ্রিয়াকে খুন করেছ...।'

'হ্যাঁ, ঐ বেশ্যার মুখটা মনে পড়লেই আমার ভয় করে।'

'মনে পড়ে? মন আছে তোমার?'

'আছে বলেই তো এ্যাদ্দিন পর ঝিল্লির জন্যে ফিরে এলাম। কিন্তু মনে রেখো গগনদা, জটা মাস্তানের মন নিয়ে যত ঠাট্টাই করো না কেন, কাল যদি ঝিল্লিকে না পাই, এই খালে তোমার লাশ আমি পচিয়ে দেব।'

গরিবের ঘর মেয়েটা একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো আলো করে রেখেছে। অভাব শুধু এই মেয়েদের রূপ কখনও স্পর্শ করে না। সন্ধেবেলা একলা বসে আপন মনে গান গাইছিল, 'বঁধূ ধরো ধরো মালা পরো গলে'। কারও কাছে কখনও শেখেনি। এই মেয়েটাকে জটার চাই, এই মেয়েটার জন্যেই এতোদিন পর ফিরে এসেছে জটা। গগন সরকার ভালো করে জানে ঝিল্লিকে নিয়ে কি করবে জটা। দালাল গগন সরকার জীবনের কাছে শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছে। এটা তার নিজেরই মনে হয়। জটা যে ঝিল্লিকে তার হাতে তুলে দিতে বলে, এটাই তার হেরে যাওয়া।

সোমবার রাত আটটা বাজতে তখন মিনিট কুড়ি বাকি।

খালপাড়ে বাগুইহাটির ভাঙা মিনিটবাসটা যেখানে পড়ে আছে, তার পাশে এসে পৌঁছে যায় গগন সরকার। কালো গাড়িটা থেকে নেমে আসে জটা। নেমেই সে গগনদাকে দেখতে পায়। গাছের আড়ালে হারিকেনের আলোর মতো একটা শাড়ি।

গগন সরকার এগিয়ে আসে। খালপাড়ে হতাশার তিমিরস্তব্ধ শূন্যতা।

'আমার টাকা?'

'এই নাও, জটা কাউকে ঠকায় না।' দশটা একশো টাকার নোট আগেই গুছিয়ে রাখা ছিল। জটা বাড়িয়ে ধরে গগনের মুখের সামনে। গগন যেন মুঠোর মধ্যে টাকাটা ছিনিয়ে নেয়। গাছের দিকে একটা আঙুল দেখিয়ে বলে, 'টাকাটা ওর।'

'কেন?'

'কারণ তোমার জন্যেই ওর এই দশা আজ।'

গাছের আড়াল থেকে ব্রহ্মাণ্ডের মতো একটা পেট নিয়ে মৃদুলা এগিয়ে আসে জটার দিকে, হলুদ শাড়ির মাঝে লাল রেখাগুলি ক্রোধের অগ্নি-শলাকার মতো জ্বলে ওঠে।

মাটির ওপরে

'আসবেন তো? আপনাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। ইতি আপনার যশো।'

চিঠিটা বেশি বড় ছিল না। কোনও দুঃখের কথা, কোনও সুখ কিংবা আনন্দের কথা নয়, কয়েকটা এলোমেলো কথার পর ওই লাইনটা দিয়েই সে চিঠিটা শেষ করেছে। ভাবছিলাম, যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা? কি হবে গিয়ে? কি আর দেখব? তবু এই মুহূর্তে জগতের কোথাও আমাকে দেখতে কারও ইচ্ছে করছে, এই ইচ্ছেটার কি কোনও মূল্য নেই? আমার নিজের চেয়ে এই ইচ্ছেটার দাম কি অনেক বেশি নয়?

হয়তো এখন আর এসব ভালো লাগে না। লাগে না, তবু মনের কোণে একটা পুরোনো ব্যথা, বাংলা ভাষার বড় শান্ত নিঃসঙ্গ এই শব্দটা, এক টুকরো ছোট্ট ব্যথা যে জমে আছে।

'মিলনদা আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?'

'কেন, আমার চেয়ে অনেক ভালো ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।'

'হবে না। কে আমাকে বিয়ে করবে বলুন? কেন করবে আমাকে?'

'শোনো যশোমতী, তোমাকে একটা কথা বলি। নিজের মুখে কখনও কাউকে বিয়ের কথা তুমি বোলো না। এত হীনমন্যতায় তুমি ভুগবে কেন?'

'জানি, এতে মেয়েরা ছোট হয়ে যায়।'

'জানোই যদি, তা হলে বলছ কেন?'

'আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।'

'থাকো আরও থাকো, আরও সহ্য করো।'

'আমি আপনার ছাত্রী নই, মিলনদা।'

'ছাত্রী হলে তোমার সঙ্গে এত কথাই আমি বলতাম না।'

'অধ্যাপক হিসেবে আপনি অনেক নাম করবেন কিন্তু আপনি কোনওদিন প্রেমিক হতে পারবেন না।'

'সস্তা নভেল পড়ে পড়ে তোমাব রুচিটাই নষ্ট হয়ে গেছে।'

'রুচিটাই দেখলেন? একটা শরীর যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখলেন না?'

সত্যিই আমার চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল রূপরাশি, অসংযমিত সৌন্দর্য, ক্ষীণ হয়ে আসছিল একটা উজ্জ্বল দীপশিখা। কি আমার করার ছিল, আমি জানি না। সে যা চেয়েছিল তাকে আমি দিতে পারিনি। কেন পারিনি সে কথা আজ আর ভেবেও কোনও লাভ নেই। হয়তো আমার দিকে সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে বার বার তার এগিয়ে আসা আমার পছন্দ হয়নি।

সত্যিই কি তাই? আমি আমার নিজেকেই চিনতে পারি না, কেমন করে আমি চিনে নেব, সে কেমন? আমি জানতাম সে কষ্ট পাচ্ছে। চারপাশের অন্ধকার তার বুকের ওপর চেপে বসছে। আর সেজন্যেই কি সে অমন করে খোলা চুলে এগিয়ে আসে আমার সামনে? কেন দেখাতে চায় তার রূপ-যৌবন? কেন মধ্যরাতে সে আমার ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়?

'আমার ঘরে তুমি ঢুকেছিলে কেন?'

'যখন ঢুকেছিলাম তখন জিজ্ঞেস করেননি কেন?'

'তাতে তোমার অনেক ক্ষতি হয়ে যেত।'

'মিলনদা, কী সুন্দর আপনার চেহারা, আপনি কতো লেখাপড়া শিখেছেন, কতো টাকা আপনার, ঈশ্বর আপনাকে সব কিছুই দিয়েছিল, শুধু একটা জিনিস দিতে ভুলে গেছে।'

'কি সেটা?'

'একটু সাহস।'

'এই সাহসটা তুমি একটু বেশিই দেখাচ্ছো।'

'কারণ আমার রক্ত।'

এই রক্তের অহঙ্কার ছিল সোমাংশুর।

যশোমতীর দাদা সোমাংশু সিংহদেব ছিল কলেজে আমার সহপাঠী। আমরা সবাই জানতাম ও বীরভূমের এক রাজবাড়ির ছেলে। অনেক, অনেককাল আগে ওরাও নাকি রাজপুত ছিল। সোমাংশু বলত, ওদের বাড়িতে মাটির নীচে অনেক ধনরত্ন সোনা হিরে জহরৎ লুকোনো আছে। কোথায় আছে, কেউ তার হদিশ জানে না। এদিক ওদিক অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে। কেউ পায়নি। পায়নি যে তার কারণ এই হিরে-জহরৎ নাকি একদিন সোমাংশুই পাবে। ওরা এক ভাই এক বোন। ও থাকতো কলেজ হস্টেলে। সোমাংশু সর্বক্ষণ রাজবাড়ির গল্প করত, সিগারেট খেতো না, বলত, রাজপুত্র সিগারেট খায় না, সুরাপান করে। অথচ জামাকাপড় যা পরত, তাতে অভিজাত্য ছিল না। আমি জানতাম এক কাপ চা খাওয়াবার ক্ষমতাও ওর নেই। বলত, 'এটা কলকাতা শহর, তাই এক টেবিলে তোদের সঙ্গে বসে আছি, বীরভূম হলে তো তোরা আমাদের প্রজা। রাজার অবস্থা এখন শোচনীয়। তবু রাজা তো। আমাদের বংশে মেয়েদের কাছে ধর্মটাই বড়। আমার বোনের হাতের আংটিতেও বিষ আছে। সাজ্জাদ, যদি কখনও আমাদের বাড়িতে যাস, সাবধানে থাকিস।'

বি. এ. পাশ করে চলে যাবার পর বছর পাঁচেক ওর খবর কিছু রাখতাম না।

একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল হাওড়া স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আমি ট্রেন থেকে নেমেছি, ও ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

দু-একটা কথা হবার পর জিজ্ঞেস করলাম 'কি করছিস তুই?'

'কিছুই না। আমাদের কিছু করতে হয় না। রাজার ছেলে আমি, শিকার করে দিন কাটাবার কথা। তবু তো মাঝেমধ্যে একটু চাষবাস দেখি।'

'কোনও কাজে এসেছিস?'

'না, ঠিক কোনও কাজে নয়। আমাদের বাড়িতে মাটির নীচে নাকি তেল আছে। কোথায় তেল? খোঁড়াখুড়ি করতে গিয়ে মাটির নীচে পাওয়া গেছে দুটো কামান। রাজা তো এমনি হয় না। অনেক যুদ্ধ করেছে আমাদের পূর্বপুরুষরা। কামান দুটো সরকাব থেকে নিয়ে গেছে। আমি একটু দরকারে ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়েছিলাম। ওসব জায়গায় তোদের ঢুকতে দেবে না। আয় না একদিন আমাদের বাড়ি। যশোমতীকে তোর ভাল লাগবে। বিয়ে করেছিস?'

'না। তুই?'

'আমি যাকে বিয়ে করব তার কাছে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয়, কোমরে তলোয়ার নিয়ে। তলোয়ার আছে, ঘোড়া নেই। তা হলে আসছিস তো?'

'যাবো। তোর ঠিকানাটা লিখে দে।'

'ঠিকানা? যে বাড়ির নীচে কামান থাকে তাদের আবার ঠিকানা লাগে?'

গিয়েছিলাম। একবার দুবার তিনবার।

সত্যিই ওরা রাজা ছিল। সবাই জানে, মানে, সম্মান করে। প্রজারা খুবই গরিব। তবু তারাই রাজপুত্র রাজমাতা রাজকন্যাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। খেত-এ যেটুকু ফসল হয়, তাই দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে নিঃস্ব রাজপরিবারকে। অনেক দূর থেকে সুরাও আসে। সে সুরায় নদীর তীরে নৃত্য করে উর্বশী। জোছনায় যশোমতী নাচছিল, তার ছেঁড়া বেনারসী থেকে খসে পড়ছিল সোনালী জরি।

একদিন সোমাংশুকে বললাম, 'বাড়িটা বেচে দে।'

'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'কেন?'

'যারা কিনবে তারা হয়তো এখানে তেলের কল বসাবে, কাগজের মিল করবে, সাবানের ফ্যাক্টরি বানাবে, একটা রাজবাড়ি ভেঙে ফেলতে বলছিস?'

'সবই তো ভেঙে গেছে। আছে তো কখানা জরাজীর্ণ থাম। তোরা তিনজনে একদিন এই ধ্বংসস্তূপে মরে যাবি, দেখিস।'

'এই বাড়ি বিক্রির কোনও উপায় নেই।'

যশোমতী তার চিঠির শেষ লাইনে লিখেছে, 'আসবেন তো?' যাবো বলেই স্থির করলাম।

'কাকে চাই?'

ফতুয়া পরা যে লোকটি বারান্দায় হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে বসেছিল তার বয়স প্রায় সত্তর। তার প্রশ্নে নয়, কণ্ঠস্বরে আমি প্রায় চমকে উঠলাম। এই গলা শুনতে হয় যশোমতীকে?

'যশোমতী।'

'যশোমতী না যশোদা?'

বৃদ্ধ তার ওই বিকট গলায় ডাক দিলেন, 'শম্ভু, ও শম্ভু ইদিকে আয় তো।'

আন্ডারওয়ারের ওপর গামছা জড়াতে জড়াতে একটি লোক এসে দাঁড়াল। বয়স চল্লিশ চুয়াল্লিশ বাহান্ন ছাপ্পান্ন, যা খুশি হতে পারে। মাথাভর্তি চুল। লম্বা জুলপি। গাল দুটো, দুটো নয় যেন চারটে। মোটা গোঁফ। কালো। গলায় একটা সোনার চেন।

'কাকে চাই?'

'যশোমতীকে।'

লম্বা বারান্দার দুপাশে মুখোমুখি পাঁচ-ছ খানা ঘর। পর্দা সরিয়ে কয়েকটি মুখ উঁকি দিয়ে দেখল আমায়। একটা ঘরে পুজো হচ্ছে। ঘণ্টা বাজার বিচ্ছিরি শব্দ। একটা ঘরে টিভি চলছে। কালার টিভি। আর একটা ঘরে হারমোনিয়ামের ব্রহ্মাইটিসে ভাঙা গলায় নজরুল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'কি হন আপনি?'

মিথ্যে বলা ছাড়া কোনও রাস্তা নেই। বললাম, 'মামা।'

'আপনি মামা?' লোকটি কিঞ্চিৎ সন্দেহগ্রস্ত। উত্তর দেবার আগেই লোকটা আঙুল তুলে দেখাল, 'ওই যে।'

বিরাট একটা রান্নাঘরে বিশাল এক উনুনের সামনে বসে আছে এক মহিলা। মাথায় ঘোমটা।

হাতে খুন্তি। কিছু একটা রান্না হচ্ছে। তেল মশলার ঝাঁঝালো গন্ধে নাক জ্বলছে।

'যশোদা তোমার মামা এসছে।'

মহিলা উঠে দাঁড়ায়। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। লম্বা ঘোমটার আড়ালে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'আপনি বসুন।' একটা বেতের মোড়া লোকটি এগিয়ে দেয়। আমি বসলাম। আর একটা মোড়া টেনে নিয়ে সে নিজেও বসল।

'চা খাবেন?'

'না না, চা আমি বেশি খাই না। তা ছাড়া রান্না হচ্ছে।'

রান্না শেষ হয়ে গেছে। সাড়ে আটটা বাজে।

'একটু পরই আমরা ভাত খাবো। আপনার ভাগ্নী তো এক্সপার্ট। আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে উনিশ। ওই তো সামলাচ্ছে সব। বারান্দায় যাকে দেখলেন, উনি আমার কাকা। কাকার ছেলেমেয়ে নেই। কাকীমা গেছে উলুবেড়িয়া। বোনকে দেখতে গেছে। আমরা চার ভাই। আমিই বড়। পরের দু ভাইয়ের ছেলেমেয়ে সাতটা। আমার তিনটি। এক মেয়ে দুই ছেলে। মেয়ে বড়। দুবার মাধ্যমিক দিয়ে তো পাশ করতে পারলো না। মেয়েরা পাশ করেই বা কি করবে বলুন? একুশ বছর বয়েস হলো। দেখবেন তো মামা, ভালো ছেলে যদি সন্ধানে থাকে, একটু জানাবেন। বিশ পঁচিশ যা ক্যাশ চায় দেব, খাট আলমারি সোফা ফ্রিজ সব দেব। মাস চারেক আগে ওদের মা মারা গেল। কাকা বলল, শম্ভু বিয়ে তোকে করতেই হবে, ছেলেমেয়েগুলোকে দেখবে কে। কাকার কথা তো আর ফেলতে পারি না।'

লোকটা একাই বকে যাচ্ছে। যশোমতী একটি কথাও বলেনি এখনও। মুখটা সরিয়ে রেখেছে। কড়াইটা নামাল। গনগন করে জ্বলছে উনুন। জ্বলন্ত কয়লার আঁচে মুখটা এবার দেখতে পেলাম। এ মুখ আমি চিনি না।

শম্ভু আবার কথা বলতে শুরু করে, 'দু মাস আগে বিয়ে হলো। আর এ দু মাসেই ওর হাতে গোটা সংসার। খাটতেও পারে আপনার ভাগ্নী। সেই ভোর চারটের সময় ওঠে। উঠে কী যে করে কে জানে। পাঁচটা নাগাদ উনুন ধরাবে, চা করবে, জলখাবার করবে, সব নিজের হাতে। আমাদের তো সময়ই হয় না। সারাদিন দোকান নিয়ে পড়ে আছি। আগে একটাই ছিল। পৈতৃক। এখন তিন ভাইয়ের তিনটে। ছোট ভাই মণ্টুর অবশ্য ব্যবসায় একেবারেই মন নেই। সি পি এম করে। বলছে তো সামনের বার নাকি ভোটে দাঁড়াবে। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে রোজগার আমরা মন্দ করি না। চিন্তা নেই, আপনার ভাগ্নী এখানে সুখেই থাকবে।'

'যশোমতী গেল কোথায়?'

কাকাকে খেতে দিচ্ছে। 'আপনি বসুন, আমি একটু চান করে আসি। সারাদিন মাল ঘাঁটাঘাটি করে শরীরটা তো ধুলো আর ময়লায় ভরে থাকে। তাই আমি গায়ে জল না ঢেলে খেতে পারি না।' শম্ভু উঠে চলে গেল।

'পুজোর দিনকটা এবার আমার এখানে থাকিস। খুব ধূমধাম করে পুজো করছি।'

সোমাংশুর চিঠি পেয়ে চলে গিয়েছিলাম। পুজো নয়, প্রতিমা নয়, ভক্তি নয়, তিনটে দিন যশোমতীকে সারাক্ষণ দেখতে পাবো, এই আশায়। দেখেছি সকাল দুপুর রাত, সর্বক্ষণ। মোটেই ধূমধাম করে নয়, খুবই সাধারণভাবে পুজো হচ্ছিল। চুরাশি বছরের বৃদ্ধ কুলপুরোহিত পুজো

করছিলেন। সেটাই দেখার মতো। সোমাংশুর মা বার করে দিয়েছিলেন যুগযুগান্তরের ধুলো-জমা রাজকীয় প্রদীপগুলো। সন্ধেবেলা সেই প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি হচ্ছে। অন্ধকারের শিখা হয়ে জ্বলছে যশোমতী। পরিত্যক্ত লোহার সিঁড়ির নীচে নবমীর চাঁদের আলোয় যশোমতী আমার হাত ধরে। সেই হাতে ছিল একমুঠো হৃদয়।

'পরশু আপনি চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন?'

'সময় হলে ঠিকই নিয়ে যাবো।'

'সময় হয়নি?'

আমি কিছু বলতে পারি না। পারি না যে, তার কারণ সোমাংশু। সোমাংশু বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এটা সে ভালোভাবেই বুঝেছিল আমি এসেছি যশোমতীর জন্যে। যে গলায় সে আমার সঙ্গে কথা বলে, সে গলা বন্ধুর নয়, যেন সর্বস্ব হারিয়ে দিশাহারা এক মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হাহাকার, 'মিলন, কলেজে তুই ছাড়া কেউ আমার বন্ধু ছিল না। আমার একটা কথা তোকে শুনতেই হবে।'

'কি কথা?'

'আমাদের পুরোহিত আচার্য রুদ্রপ্রয়াগ ওর কোষ্ঠি বানিয়েছিলেন। ওর ভাগ্য গণনা করে তিনি বলেছেন, পঞ্চাশোর্ধ্ব বিপত্নীক ব্যক্তির সঙ্গে ওর বিবাহ, সেই বিবাহের তিন মাসের মধ্যেই রাজপরিবারে গুপ্তধন উদ্ধার। এই গণনা নির্ভুল।'

'কি চাস তুই?'

'সেটা কি তোকে খুলে বলতে হবে?'

যশোমতী এলো। সঙ্গে আরও দুটি বউ। যশোমতী কিছু জিজ্ঞেস করল না। শম্ভু চান করে এসেছে। পাটপাট করে আঁচড়ানো চুল। পরনে লুঙ্গি। গায়ের ওপর একটা ভেজা গামছা। যশোমতীকে ভাত বাড়ায় সাহায্য করছে বউ দুটি। নিশ্চয়ই শম্ভুর ভাইয়ের বউ। রান্নাঘরটা এতই বড় যে, একসঙ্গে মেঝেতে দশ বারোজন লোক বসতে পারে।

শম্ভুরা তিন ভাই, আরও পাঁচটি ছেলেমেয়ে, মোট আটজন একসঙ্গে খেতে বসল। মেঝেতে। স্টিলের থালায় বাটিতে ভাত মাছ ডাল তরকারি নিঃশব্দে পরিবেশন করছে যশোমতী। ভাতের থালা থেকে গরম ধোঁয়া উঠছে। একটি বউ আমার হাতে এক কাপ চা বাড়িয়ে ধরে। চা খেতে খেতে দেখছিলাম ওরা ভাত খাচ্ছে। কেন আমি এখানে বসে আছি বুঝতে পারছি না। কেন কেউ আমাকে কারও ঘরে ডেকে নিয়ে গেল না কে জানে। এমনকি যশোমতীর স্বামী শম্ভু এত কথা বলল, কিন্তু তার ঘরে তো নিয়ে গেল না। এ কেমন বাড়ি? এ কেমন পরিবার? একজন অতিথিকে এরা রান্নাঘরে বসিয়ে রেখেছে! যশোমতী এখানে থাকে কি করে? সত্যিই কি আমাকে দেখতে চাইছিল সে? কই, দেখল নাতো। একবারও মুখ তুলে তাকাল না আমার দিকে। একটা কথাও জানতে চাইল না। অথচ পুজোর তিনটে দিন যখনই সুযোগ পেয়েছি ওর সেই প্রিয় গাছটার নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি জানি ওই পাতার শব্দ, ওই গাছের নীচে রোদ, ওই গাছের নীচে ছায়া, সেই তার নির্জন সঙ্গী, সেখানেই পড়ে আছে তার কামনা, তার শখ ও উচ্চাকাঙক্ষা। আমাকেই শুধু বিশ্বাস করেছিল যশোমতী।

'মাটির নীচে গুপ্তধন আছে বলে বিশ্বাস হয় আপনার?'

'না, হয় না।'

'তাহলে?'

'কি তাহলে?'

'যে সেটা বিশ্বাস ক'রে নিজেকে ধ্বংস করছে, আমাকে তিলে তিলে মারতে চাইছে, তাকে কিছু বলছেন না কেন?'

রাজবাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ছোট্ট নদী। বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেল। বিকেলবেলা। সন্ধের মুখে প্রজারা এলো রাজবাড়িতে প্রণাম করতে। একে একে প্রণাম করল রাজমাতাকে, সোমাংশুকে, যশোমতীকে। একেবারে পা ছুঁয়ে গড় হয়ে প্রণাম করল। রাজমাতা প্রত্যেকের হাতে শালপাতায় তুলে দিলেন মিষ্টি। মিষ্টি মানে বোঁদে।

ওদের খাওয়া হয়ে গেছে।

সবাই আসন ছেড়ে উঠে পড়েছে। পড়ে আছে এঁটো থালাবাটি, প্রচুর উচ্ছিষ্ট। মানুষ যে এত নোংরা করে খেতে পারে, আগে আমি কখনও দেখিনি। যশোমতী মেঝেতে বসে আছে। এ কোন যশোমতী?

উঠোনের এক পাশে জমে উঠল শালপাতা। শুধুই পাতা। একটা পাতায় একটা বোঁদেও পড়ে থাকে নি।

রাজমাতা বললেন, 'যশো, এঁটো রাখতে নেই। শালপাতাগুলো কুড়িয়ে ফেলে দে।'

যশোমতী বলল, 'আজ আমি কারও এঁটো ছোঁবো না।'

'কেন?'

'আজকের দিনটা আমাকে ছেড়ে দাও মা, আজ প্রজারা আমাদের প্রণাম করতে এসেছে, আজ তো আমি রাজকন্যা মা।'

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের শেষ দিন

ক্যালেন্ডারে বাঘের ছবিটা তাকে চিড়িয়াখানার কথা মনে করিয়ে দেয়। চিড়িয়াখানায় কি যাওয়া যাবে? একবার ঢুকলে তো আর অন্য কোথাও যাওয়ার সময় থাকবে না। চিড়িয়াখানার কথায় পরমেশের মনে পড়ে একবার লখনউয়ের চিড়িয়াখানায় সে এবং বন্দনা সাপের ঘরের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। সেই বিরাট কাচের ঘরটায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল কয়েকটা ইঁদুর। মরা ডাল জড়িয়ে ধরে বিশ্রাম করছিল বড় বড় সাপ। একটু নড়ে চড়ে উঠলেই ইঁদুরগুলো ভয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে। কেউ এক ইঞ্চি জায়গা সরে না, সবাই অপেক্ষা করছে কে কখন সাপের পেটে ঢুকবে। রাকা নিশ্চয়ই হাতির পিঠে চড়তে চাইবে। চাইলে চড়বে। কাল ধর্মতলায় এক মাটির পাহাড়ের ওপর পরমেশ দেখেছে পাশাপাশি জেমিনি ও অলিম্পিক সার্কাসের বিজ্ঞাপন। পার্কসার্কাস আর হাওড়া ময়দান। একটা, চারটে, সাতটা। একটার শোয়ে বরং সার্কাসে যাওয়াই ভালো। রাকার খুব ভালো লাগবে। চিড়িয়াখানায় বাঘের দিবানিদ্রা, সিংহের ঝিমুনি, জিরাফ, গণ্ডার এসব দেখার চেয়ে সার্কাসে যাওয়াই ভালো। ফাস্ট ইয়ারে পড়ার সময় এই পার্কসার্কাসেই ট্রাপিজের খেলা দেখতে দেখতে ট্রাপিজের কী নেশাই না তাকে পেয়ে বসে। একদিন ভোরবেলা অনেকক্ষণ সার্কাসের তাঁবুর আশেপাশে সে ঘুরে বেড়িয়েছে। এদের চেয়ে সাহসী মেয়ে সে আর কখনও দ্যাখেনি। আগুনের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে যাওয়া বাঘ, সেই রোমাঞ্চকর সাইকেল, ব্যালান্সের খেলা, একটা শরীরের ওপর দশটা মেয়ে।

শুভেন্দুকে একটা ফোন করে নিলে ডগ শোতে যাওয়া যেত। ওদের বাড়িতে কুকুর আছে। রাকার সঙ্গে রিমার খুব ভাব। অতগুলো কুকুর একসঙ্গে দেখে রাকার আনন্দের আর সীমা থাকবে না। রবীন্দ্রসরোবরে অদ্ভুত সব ড্রিল আর জিমন্যাসটিকের ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতার বাইরে থেকে ব্রতচারী নাচের দল আসছে। নাগেরবাজারে মাদার টেরেসা একটা শিশুউদ্যান উদ্বোধন করবেন, সেখানেও যাওয়া যায়, সেই উপলক্ষে আছে বিকলাঙ্গ শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। না, ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। ওই শিশুদের দেখে রাকার মন খারাপ হয়ে যাবে, হাজার প্রশ্ন করবে। কিন্তু মাদার টেরেসাকে একবার দেখে রাখলে ছেলেটা বড় হয়ে বলতে পারতো।

সকাল সাতটায় গারডেনরিচে কাপুরবালা উদ্যানে শিশুদের খেলাধুলো। সকাল আটটায় চিড়িয়ামোড়ে শিশুবর্ষ উদ্‌যাপন। নন্দন মিলনবীথির অনুষ্ঠান হরিনাভিতে নটায়। সারা বাংলা শিশুসংস্থার পরিচালনায় কোন্নগর হাইস্কুলে কেন্দ্রিয় শারীরশিক্ষা শিবির। বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল শিবির কর্তৃক সকালে রুট মারচ্। লাইটহাউস ফর দি ব্লাইন্ড-এ শিশুদের বিচিত্রানুষ্ঠান। যাদুঘরে দশটায় একশোটি মরশুমি পাখির বিশেষ প্রদর্শনী। এগারোটায় প্রেস ক্লাবে ক্যালকাটা ফোটো জারনালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে 'দি চিলড্রেন' ফোটো প্রদর্শনী। অ্যাকাডেমীতে বারোটায় ষোলো বছরের নীচে শিশুদের তোলা ছবি। শিশু উদ্যান থেকে

সভ্যসভ্যাদের এক মশাল শোভাযাত্রা বেরিয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমার পর রাজভবনে রাজ্যপালের হাতে মশাল অর্পণ করবে। বেলা একটায় সায়ান্স কলেজ-এ ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক, শিশুদের হাতে তৈরি যন্ত্রপাতি। দুপুর দুটোয় শিশির মঞ্চে শিশুদের নৃত্যনাট্য সুনির্মল বসুর শামিয়ানা ; সুখলতা রাওয়ের গরিব মুচি, রবীন্দ্রনাথের কালমৃগয়া। তিনটের সময় ইউসিসে চ্যাপলিনের ছবি। বিকেল চারটেয় ঢাকুরিয়ায় শিশুদের রামায়ণ পাঠ, পাঁচটায় মহাজাতি সদনে কে লালের ম্যাজিক, ছটায় গৌরীবাড়ি শিশুউদ্যানে শিশুদের আরতি নৃত্য।

কাল সোমবার, পৌষ মাসের ১৫ তারিখ, ডিসেম্বরের একতিরিশ। তিথি-ত্রয়োদশী, নক্ষত্র রোহিনী। দিনে সকাল আটটা আট মিনিটে জোয়ার আসবে, বারোটা দশ মিনিটে ভাঁটা। গুপ্ত প্রেস ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পার্থক্য ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড ও ২ মিনিট ২২ সেকেন্ড।

কতো রকমের কেক পেসট্রি পাওয়া যায় পার্কস্ট্রিটের দোকানে। ওর যেটা ইচ্ছে হবে খাবে, ঠোঁট দুটো ক্রিমে সাদা হয়ে যাবে। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ নিয়ে আসছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নির্বাচিত শিশুদের। রাকা ওদের দেখে অবাক হবে, খুশি হবে, হাততালি দেবে। কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে আমি ওকে দেখাবো কি করে সত্যিকারের প্লেন আকাশে উড়ে যায়।

বিদ্রোহের গান মুক্তির গান গেয়ে শিশুরা করবে পথ পরিক্রমা। আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো পথের ধারে, রাকার ছোট্ট শরীরটা উত্তেজিত হবে। হ্যাঁ, আমরা এসবের ভেতর দিয়েই যাবো। আমি তোর বাবা, আমি সারাক্ষণ তোর হাত ধরে থাকবো না, তাই বলে আমাকে ফেলে চলে যাস না, বড় গোলমেলে এই কলকাতার রাস্তা। আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। কলকাতার রাস্তায় এখন এত বেশি অ্যাকসিডেন্ট হয়, বড় ভয় করে বাবা। গাড়ির রাস্তায় নেমে যেওনা। কাল তোমাকে দেখাবো কেমন করে রাস্তা পার হতে হয়। এখন খবরের কাগজে আবহাওয়ার খবর যেমন থাকে তেমনি থাকে রোজ দুর্ঘটনার খবর। তোমাকে আমি ঘোড়ার গাড়ি চড়াবো। কাল আমরা দুজনে, আমরা বাপ ছেলে পাঁচ বছরের মাস্টার রাকা মুখার্জী আর পঁয়তিরিশ বছরের পরমেশ মুখার্জী আমরা দুজনে এই শহরটাকে দেখব। কিংবা হয়তো শহরে থাকলামই না, হাওড়া স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে চড়ে দূরে কোথাও চলে গেলাম। একটা জঙ্গলে ঢুকে তুমি আর আমি চড়ুইভাতি করব। আমরা জল আনবো, কাঠ কাটবো, আগুন জ্বালবো, রান্না চড়াবো। আর যদি তুমি পিকনিক করতে না যাও, আমরা এখানেই থাকব। আসাম থেকে চা বাগানের শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা আসছে, রাজস্থানী শিশুরা আসছে হোলি উৎসব করতে, অবনমহলে চেকোস্লোভাকিয়ার পুতুল। কাল কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল তুমি ক্রিকেট প্লেয়ার হবে, আমি যা খেলতে পারি নি, তুমি সেই টেস্ট খেলবে। আমি স্কুল টিমে খেলেছি, ইন্ডিয়ান স্কুল টিমের হয়ে ইংল্যান্ড গিয়েছি, উনিশ বছরের কম-বয়সী ছেলেদের টিমে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছি। আমি ইউনিভার্সিটি টিমের ক্যাপটেন ছিলাম। বেঙ্গলের হয়ে কতোবার রনজি খেলেছি।

আমি কি ছিলাম জানিস? ওপেনার। স্কোরবোর্ডে একটাও রান ওঠে নি, একটাও বল হয়নি, আমি তখন ব্যাট করতে নামছি। দিনের প্রথম বলটা খেলতে হবে আমাকে। আমার কতো এ্যালবাম আছে, তাতে বড় বড় প্লেয়ারদের সঙ্গে, কতো রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, ইংল্যান্ডের রানি কতোরকম ছবি আমার আছে। যখন আমি স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মোহনবাগান এসব টিমের হয়ে খেলেছি তখন আমার খুব নাম। কোথায় খেলতাম সেই মাঠগুলো একদিন ঘুরে ঘুরে তোমায়

দেখাবো। এখন আর শুধু ভাল ব্যাট করলেই হবে না রাকা, খেলার টেকনিক একেবারে পালটে যাচ্ছে, এখন ভালো ফিল্ডিং না করলে দলে তুমি ঢুকতেই পারবে না। আস্তে আস্তে বড় হতে হতে বুঝবে ফিটনেস কাকে বলে। আজ আমি তোর জন্যে ব্যাট বল উইকেট কিনে এনেছি। জানিস রাকা, আমার অ্যালবামে একটা ছবি আছে, একবার ফিরোজ শা কোট্লায় আমরা প্লেয়ার আম্পায়ার সবাই মুখে হাত দিয়ে শুয়ে আছি, তখন আমার সেঞ্চুরি করার জন্যে আর তিন রান দরকার, হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এসে হাজার হাজার লাল আর সবুজ পাখি মাঠ ছেয়ে ফেলেছে। তারা অবশ্য কিছুক্ষণ পর আবার উড়ে গেছে, কিন্তু আমার আর সেঞ্চুরি করা হলো না, আর এক রান করে আমি রানআউট হয়ে গেলাম।

পরমেশ মুখার্জী আজ ব্যাঙ্কে গিয়েছিল।

সেখানে সে দ্যাখে স্বাস্থ্যবান দুটি শিশুর ছবি বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে, তার তলায় লেখা, আপনার সঞ্চয় আপনার এই সন্তানের জন্য। রাকা একদিন বলেছিল, দ্যাখো আকাশে ক্ষীরকদম্বের মতো চাঁদ উঠেছে। আজ ক্ষীরকদম্বের মতো নয়, আর একটু বড় চাঁদ উঠেছে। আমি একজন শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষ, মাঠের মধ্যে কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আমি জানি, কতো জোরে বল আসছে আমি জানি, উইকেটকিপার কোথায় রয়েছে আমার খেয়াল আছে, স্লিপে কারা, কভার, এক্সট্রা কভারে কে, স্কোরবোর্ডে খুব দ্রুত আমার রান উঠছিল। তখনই সব গোলমাল হয়ে গেল। আমার টুপি গ্লাভ্স প্যাড সব ঠিক ঠিক জায়গায় ছিল। হঠাৎ আমি কেন যে এত উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম কে জানে। যে আমি শিশিরভেজা উইকেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম স্থির আত্মবিশ্বাসে, সেই আমি একদিন সন্ধেবেলা দেখলাম সব তছনছ হয়ে গেছে। সব ভাঙছে, ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, আমার বিশ্বাসের ভেতর একটা বিষাক্ত পোকা ঢুকে পড়েছে। খুব শক্ত ছিল আমার ডিফেন্স, তীক্ষ্ণ ছিল আমার দৃষ্টি, প্রতি মুহূর্তে আমি সচেতন, প্রচণ্ড জোর ছিল আমার কবজিতে, নিখুঁত ছিল আমার সময়জ্ঞান। তবু সেই আমি একটা বড়রকমের ভুল করে ফেললাম। সাতটা উইকেট পড়ে গেছে, তখনও আমি একদিকে আছি। দলের পতনের মুখে একটা দিক তো আমি একাই সামলাচ্ছিলাম। বিপক্ষ জানে আমার উইকেটটা নিতে পারলেই আর কোনও চিন্তা নেই। তবু একদিন যে ভাঙন শুরু হয়ে গেল আমার নিজের মধ্যে, তাকে আমি রোধ কবতে পারলাম না।

সত্যিই কি পৃথিবীতে কোথাও কেউ ভালো আছে? মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সেই ভালোটা গিয়ে একবার দেখে আসি। আলমারিতে কাপ মেডেল ট্রফি ম্যান অব দি ম্যাচ, ম্যান অব দি সিরিজ। মেডেলগুলো অন্ধের চোখের মতো চেয়ে আছে আমার দিকে। একদিন তোমাকেও শিখিয়ে দেব কেমন করে ব্যাট ধরতে হয়, কেমন করে উইকেটের সামনে দাঁড়াতে হয়, বোলারের দিকে তাকাতে হয়, বলের ওপর চোখ রাখতে হয়, কোনটা মারতে হয় কোনটা ছেড়ে দিতে হয়, কিন্তু তারপর? তার পরের কথা ভেবে তো লাভ নেই।

রাকা একদিন খুব অসুস্থ ছিলি তুই। খুব ইচ্ছে করছিল একবার দেখি তোর মুখখানা, কষ্টে লাল হয়ে আছে তোর মুখ। জ্বরে তোর গা পুড়ে যাচ্ছে, সেদিন দেখতে পেলাম না তোকে। পরদিন ভোরবেলা ফোন করে জানলাম তোমার জ্বর নেমেছে। সেদিন সকালে তুষারের ছেলের পায়ের অপারেশন হবে পার্কসার্কাসে একটা নার্সিংহোমে, সেখানে আমি সকাল সকাল পৌঁছে গেছি, তুষারের ছেলেটা নীল পর্দা ঢাকা ঘরে ধীরে ধীরে গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। কী যে হলো আমার, নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে চলে এলাম বৌবাজার। হাঁটতে হাঁটতে একটা

মসজিদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, দেখি ছেঁড়া শাড়ি পরা অল্পবয়সী এক ভিখিরি মা কোলে তার বাচ্চাটাকে নিয়ে আমার কাছে ভিক্ষে চাইছে। দেখে বুঝলাম শিশুটির কঠিন অসুখ, সহজে সারার নয়, বললাম ওই তো হাসপাতাল ওখানে নিয়ে যাও না, সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো কে ওকে কার্ড করে দেবে, বললাম, এসো আমার সঙ্গে। হাসপাতালে ওকে নিয়ে এলাম। একটি লোকের হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে অসময়ে কার্ড করালাম, ডাক্তার দেখালাম, বিনে পয়সায় কিছু ওষুধ পেলাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম তেইশ টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা। কুড়িটা টাকাই মেয়েটাকে দিয়ে দিলাম। তোমার মুখ রাকা, সর্বক্ষণ তোমার মুখ মনে পড়ছিল। তোমার কথা ভাবতে ভাবতে এক অপরিচিত ভিখিরি মায়ের ছেলের জন্যে হাসপাতালে কী অদ্ভুতভাবে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, খালি মনে হচ্ছিল আগের দিন রাত্রিবেলা কী অপমানই আমাকে সহ্য করতে হয়েছে।

এরপর আরও কয়েকটা দিন চলে গেল। চারপাশটা একটু শীতল হয়ে আসে।

এবং তখনই একদিন পরমেশ মুখার্জী এই দিনটি পেয়ে যায়। এই দিনটি সে কাটাবে তার ছেলের সঙ্গে। সমস্তদিন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাবা এবং ছেলে দুজনে একসঙ্গে থাকবে, ঘুরবে ফিরবে, বেড়াবে, খাবে। শুধু তারা দুজনে। বন্দনা বলেছে সে যাবে না।

খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে, পরমেশ বেরোয় তার ছেলে রাকার উদ্দেশে। ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ায় বিডন স্ট্রিটে একটা পুরোনো আমলের অভিজাত বাড়ির সামনে। পরমেশ ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে।

এ বাড়ি যত ঐশ্বর্য, যত অহঙ্কার, যত আভিজাত্য নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন, পরমেশ জানে এখানে কেউ তাকে বসতে বলবে না, চা খেতেও বলবে না। না বলুক। সে শুধু তার ছেলে রাকার হাত ধরে নেমে আসবে। বন্দনার সঙ্গে এই তার কথা আছে। এই নেমে আসতে যেটুকু সময় লাগে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে পরমেশ। কিন্তু এ কি? দোতলায় ঢোকার মুখে, গেটটায় তালা ঝুলছে। কেউ নেই নাকি? পরমেশ নেমে আসে। তার পাশ দিয়ে লম্বা ঘোমটা টেনে বাড়ির একটি বউ চলে যায়। একতলার বৈঠকখানা ঘরের সামনে বন্দনার বাবার কম্পাউন্ডার হিরণকাকার সঙ্গে দেখা হয়।

পরমেশ জিজ্ঞেস করে, 'ওরা নেই?'

উত্তর আসে, 'না তো।'

'কোথায় গেছে?'

'ওরা তো তারকেশ্বরে গেছে। ডাক্তারবাবুর গাড়িতে। তুমি জানো না কিছু?'

'না।'

'খোকার অসুখের সময় বন্দনা মানত্ করেছিল, ওখানে খোকার চুল দিতে গেছে।'

পরমেশ কথা বাড়ায় না। নামছে যখন বিলাস তাকে চা খেতে বলে। পরমেশ শোনে না। বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে ওঠে। ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়।

বন্দনা, তুমি বেথুন থেকে অনার্স নিয়ে পাশ করেছিলে। এটা কি করলে বন্দনা? আমাকে তুমি কথা দিয়েছিলে আজকের দিনটা তুমি রাকাকে ছেড়ে দেবে আমার সঙ্গে। ও তো শুধু তোমার ছেলে নয়, ও আমারও ছেলে। একটা গোটা দিন ছেলেটা আমার সঙ্গে থাকবে, এই

তো কথা ছিল, তুমি তো এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলে। তারকেশ্বরে যাবার দিনটা তোমার আগেই ঠিক করা ছিল, তাই তুমি অতো সহজেই রাজি হয়েছিলে। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছ মানে এই নয় যে, ছেলেটাও চিরকালের জন্য তোমার হয়ে যাবে। নাতিকে দেখবে বলে আমার মাও যে আজ সমস্তদিন বসে থাকবে বন্দনা। কি বলব মা'কে গিয়ে? আমার মা যে আমার খেলা দেখতে গিয়ে দেখেছে কী দুরন্ত সাহস তার ছেলের। মাথা ফেটে গেছে, আবার আমি মাঠে নেমেছি। এ কি করলে বন্দনা?

ট্রাফিক সিগনালে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে। পাশ দিয়ে শিশুরা চলেছে ব্যান্ড বাজিয়ে। বড় বড় যন্ত্রে মুখ রেখে ছোট ছোট গাল ফুলে উঠেছে কমলালেবুর মতো, তাদের মাথায় ঝালর দেয়া রাজস্থানী পাগড়ি।

কিছুদূর এগিয়ে আসার পর পরমেশ ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয়।

হেঁটে হেঁটে একটা পার্কে এসে ঢোকে। রং-বেরংয়ের ছাতার নীচে শিশুরা ছবি আঁকছে। 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় অসংখ্য শিশু ছবি আঁকছে। কেউ চুইনগাম চিবোচ্ছে, কেউ ক্যাডবেরি খাচ্ছে, কেউ লজেন্স, কেউ জল। সকলের হাতে রং তুলি। পরমেশ ঘুরে ঘুরে দেখছে। বাড়ি, নদী, মেঘ, টিয়াপাখি, পদ্মফুল, মোটরগাড়ি, পুলিশ, তালগাছ, সূর্যাস্ত, ফ্রক পরা মেয়ে, আপেল, চেয়ার, হাওড়া ব্রিজ, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ, লোডশেডিং, হারিকেন, ভিখিরি, রাজামশাই, জিরাফ, জোকার, বনমানুষ, সান্তাক্রুজ, অরণ্যদেব, জেব্রাক্রসিং।

পরমেশ ঘুরে ঘুরে দেখছে।

পরমেশ প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকায়। সেখানে রয়েছে রাকার জন্যে কেনা খেলনা পিস্তলটা। পিস্তলটা এত গরম লাগছে কেন? পিস্তলটা নিঃশব্দে ফেটে যাচ্ছে। পরমেশের পাঁচ-আঙুলে বিঁধে যাচ্ছে কাচের টুকরো। তখন শিশুদের রঙের বাক্স থেকে উঠে এসে লাল নীল হলুদ রং রোদে খিলখিল করে হাসছে।

আপনার আজকের দিনটি

সোমবার সকাল সোয়া এগারোটায় আপনি ইউকো ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের সামনে উল্টোফুটে একটা ক্রিম রঙের এ্যামবাসাডার দাঁড়িয়েছিল। আপনি গাড়িতে উঠতে গিয়ে স্লিপ করেন, আপনার প্যান্টের তলার দিকে কাদা লাগে, আপনার পরনে ছিল একটা ধবধবে সাদা স্ট্রেচলনের প্যান্ট, একটা গোলাপি রঙের হাওয়াই সার্ট। সাড়ে এগারোটার সময় আপনি অফিসে পৌঁছে ছিলেন। সকাল সাড়ে দশটায় ওয়েলিংটনের মোড়ে আপনার এক বন্ধুর বিয়ে রেজিস্ট্রি হলো। মেয়েটি আগের দিন রাত্রে চন্দননগর থেকে পালিয়ে আসে। মেয়েটির দাদা সঙ্গে পুলিশ নিয়ে আপনার বন্ধুকে খুঁজে বেড়ায়। আপনি দুপুর দুটোর সময় অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। ওই বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষে মোহনবাগান মাঠের পেছনে দুটোর সময় আপনাদের জড়ো হওয়ার কথা। আপনি গেছেন সোয়া দুটোয়। আপনাদের দলে ছিল তিনজন মহিলা ও পাঁচজন পুরুষ। আপনারা খাওয়া দাওয়া করলেন, মাল খেলেন। বিকেল পাঁচটার সময় আপনি গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেলে যান। ঢাকা থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন, ভদ্রলোক কয়েকটা সিনেমা হলের মালিক, মুসলমান, আপনি তাকে বাংলা সিনেমার একটি উঠতি নায়িকাকে পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন, আপনি ভদ্রলোককে কথা দিয়ে আসেন। মেয়েটি এখন আউটডোরে, ভদ্রলোক পরের মাসে আবার আসবেন। সাতটার সময় আপনি ধর্মতলার মোড়ে একটা ঘড়ির দোকানে আসেন, একটা লেডিজ ঘড়ি সারাতে দিয়েছেন, বাটার সামনে একটা ট্যাক্সিতে উঠে আপনি গড়িয়াহাট আসেন, একটা বিখ্যাত ফোটোর দোকানে ঢোকেন, একশো ছাপ্পান্ন টাকার একটা বিল পেমেন্ট করেন। ফোটোর দোকানের সামনে আপনার বন্ধু সুরজিৎ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল, আপনারা পার্ক স্ট্রিটে মাল খেতে আসেন।

এই সুরজিৎ ব্যানার্জী লোকটার পাল্লায় আপনি পড়লেন কি করে? না প'ড়েই বা কি করবেন? সবই ভাগ্য মশাই, কপাল, তা না হোলে আপনার মতো একটা লোক এত তাড়াতাড়ি এরকম একটা চক্রের মধ্যে এসে ঢুকলেন কি করে? একদা প্রেসিডেন্সির ছাত্র, সুন্দর চেহারা, ভালো চাকরি, রূপসী বউ, আপনার অভাবটা কি ছিল, তবু, তবু আপনি সুরজিৎ ব্যানার্জীর সঙ্গে ব্লুফিল্ম দেখতে গিয়েছিলেন। তা ওসব একটু আধটু দেখলে চরিত্র খারাপ হয়ে যায় না, রুচি নষ্ট হয় না। আজকাল তো বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের ছবিতেও ওসব থাকে। সে নিয়ে তো দুনিয়া জুড়ে লেখালেখির অন্ত নেই, ওসব আর্টের ব্যাপার। আমি তো একটা বিপ্লবী ছবি দেখতে গিয়েও দেখলাম ওসব বেশ রয়েছে। যাকগে, গিয়েছেন বেশ করেছেন।

যেকথা বলছিলাম, সেটাই বলি, এসব বাজে কথায় সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। মঙ্গলবার সকালে আপনি আপনার ভাগ্নীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আপনি অফিস যান। অফিসে একজন মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন বিকেল তিনটে। মহিলার স্বামী হাসপাতালের বেড তৈরি করে, ওষুধ সাপ্লাই করে, এবং আরও অনেক কিছু করে, অঢেল টাকা, লেকের ধারে বিরাট বাড়ি, তিনি আপনাকে শেফালির নাচের দুটো টিকিট দিতে

গিয়েছিলেন, তাঁর মেয়েটির উনিশ বছর বয়েস, মহিলার বয়স চল্লিশের বেশি নয়। মা এবং মেয়ে দুজনেই আপনাকে চায়, মাঝেমধ্যে পায়, মেয়েটিই বেশি পায়, যদিও মা মেয়ে একসঙ্গে থাকলে ওদের দিদি বোনের মতোই দেখায়। এখানেও সুরজিৎ ব্যানার্জী। মাস চারেক আগে কলামন্দিরের কাছে একটা চারতলা বাড়িতে সে আপনাকে নিয়ে আসে। মাল আপনি বিয়ের আগেও খেতেন, যদিও খুব কম খেতেন, মানে অভ্যেসটা ছিলো, এই আর কি। কিন্তু মেয়েছেলের দোষ আপনার একেবারেই ছিলো না, ওই সুদর্শন চেহারাটার সুযোগ আপনি নিতে পারেন নি, কারণ আপনি ভীরু ছিলেন। কলামন্দিরের কাছে ওই বাড়িটায় আসার পরদিন থেকে আপনি বদলে গেলেন। এর আগে আপনার মতো এত দ্রুত আর কারও পরিবর্তন হয়েছে ব'লে শুনিনি। পনের থেকে পঁয়তাল্লিশ যে কোনও বয়সের মেয়েছেলে ওখানে পাওয়া যায়। অনেকেই তাদের ভাইঝি, বোনঝি, কিংবা নিজের মেয়েকেই ওখানে নিয়ে আসে। নামকরা লেখক, বাজিয়ে গাইয়ে, সিনেমার লোকজন, ডাক্তার, খেলোয়াড়, বিজনেসম্যান, ইনকাম ট্যাক্স, চাটার্ড, অনেক রকম লোকেরই ওখানে যাতায়াত, ওখানে মানে ওখান থেকেই যে যার পছন্দ অনুযায়ী সাধ্য অনুযায়ী নিয়ে চলে যায়। যারা চারতলায় থাকতে চায়, তাদের খরচই সবচেয়ে বেশি, তাছাড়া খালি থাকে না, খালি থাকলেও একেবারে ভেতরের লোক না হোলে পাওয়া যায় না। সুরজিৎ প্রথম দিনেই আপনাকে চারতলার একটা ঘর পাইয়ে দিয়েছিল, যে মহিলাটি আপনাকে শেফালির নাচের টিকিট দিতে যায়, প্রথম দিনেই আপনি তাঁর মেয়েটিকে পেয়েছিলেন।

বুধবার সকালে আপনি অফিসের সামনে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। খুব অন্যমনস্ক ছিলেন। চারটে বয়স্ক লোক মাথায় একটা বিরাট কাচ নিয়ে যাচ্ছিলো, পেছনে একটা অল্পবয়েসি ছেলে যাচ্ছিলো মাথায় একটা ছোট কাচ চাপিয়ে। আপনি সরাসরি এসে ছেলেটিকে ধাক্কা দিলেন। ছেলেটি তাল সামলাতে পারলো না। ওর মাথার ওপর থেকে কাচটা প'ড়ে ভেঙে গেল। ওরই পায়ের ওপর দু-একটুকরো প'ড়ে পা কেটে গেল বেশ খানিকটা। আপনি ওদের সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারখানায় এলেন। বিকেলবেলা অফিসে আসতে বললেন। টাকা দিয়ে দেবেন বলে কোনওরকমে ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে অফিসে এসে ঢুকলেন। গত বৃহস্পতিবার আপনার স্টেনো মিস বসুধারা দেশাইকে আপনি একটা ভীষণ দামি ফরাসি সেন্ট উপহার দিয়েছিলেন। সে শুক্র শনি সোম মঙ্গল চারদিন অফিস আসে নি। আজ সেই সেন্টটা মেখে এসেছে। রাজভবন থেকেও সেই সেন্টের গন্ধ পাওয়া যায়। অথচ আপনি সেই গন্ধের প্রতি উদাসীন। উদাসীন ওর গত চারদিনের এ্যাবসেন্টে। বসুধারা আপনাকে জানায় ওর জ্বর হয়েছিল তাই আসতে পারে নি। আপনি ওর কথার কোনও জবাব দেন না। বসুধারা এক কাপ কফি নিয়ে আসে। আপনি কফি খেয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। বসুধারাকে বললেন, 'আজ অফিস ছুটির পর তুমি কোথায় যাবে?' বসুধারা বলে, 'বাড়ি চলে যাবো।' আপনি ওকে বললেন, 'আমার সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক সময় থাকতে পারবে?' বসুধারার যে হাসি রোজ দেখে দেখেও আপনার কাছে পুরোনো হয় না, সেই হাসি হেসে বসুধারা আপনার মুখের কাছে মুখ এনে বলে, 'গন্ধটা কেমন?' আপনি আবার বললেন, 'আমার কথার জবাব দিলে না?' বসুধারা তখন আপনাকে বলেছে, 'মাত্র দু ঘণ্টা! সারা রাত নয়?' আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, 'আজ মাত্র দু ঘণ্টাই, পরে একদিন সারা রাত।' বসুধারা আপনার টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেয়, একটা সিগারেট মুখে নিয়ে আপনার হাতে লাইটারটা দিয়ে জ্বালাতে বলে। আপনি ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দেন। বসুধারা বলে, 'পরে একদিনটা কবে?' আপনি বলেন 'নেকস্ট্ উইক।' অফিস

ছুটির পর এ, জি, বেঙ্গলের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আকাশবাণীর সামনে দিয়ে এসে আপনি বি, সি রয় ক্লাব হাউসের সামনে এসে দাঁড়ান। ততোক্ষণে আলো জ্বলে উঠছে। একটা গাড়ি এসে থামে, আপনাদের দুজনকে তুলে নেয়। আপনি বসুধারাকে নিয়ে ফুলবাগানে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কাছে একটা বাড়িতে এসে ঢোকেন। সে উনিশ বছরের মেয়েটি বসুধারার চেয়ে অনেক সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও আপনি সাহেবের কাছে তাকে আনেন নি। সে ইংরেজি বলতে পারে না। মেয়েটি সেভেন অব্দি পড়েছে। বসুধারা চমৎকার ইংরেজি বলে। কাজটা শোয়ার নয়, যখন-তখন যে কোনওরকম কথা তৈরি রাখতে হবে, চটপট বলতে হবে। বসুধারাকে আপনি গাড়িতে বসেই বলে দিয়েছেন, 'কাজটা শেষ অব্দি হোলে কয়েক হাজার টাকা তুমি পাচ্ছো।' বসুধারা বলেছে 'কয়েক হাজার মানে কতো?' আপনি বলেছেন, 'তোমার এক বছরের মাইনে। খুশি তো?' বসুধারা কোনও জবাব দেয়নি।

পরদিন বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় দমদমে সাহেবের সঙ্গে বসুধারার মীট করার কথা। বসুধারার হাতে আগের দিন রাত্তিরে আপনি একশো টাকার পাঁচখানা নোট দিয়েছিলেন, 'যদি লাগে।'

বৃহস্পতিবার সকালে ছিলো সুরজিৎ এর মায়ের অপারেশন। আপনি বেলা একটা পর্যন্ত সুরজিৎ-এর সঙ্গে হাসপাতালে ছিলেন। সুরজিৎ ব্যানার্জী ইচ্ছে করেই তার বন্ধু ডাক্তারকে ওই দিনই অপারেশন করতে বলে। একরকম জোর করেই ওই ডেটে রাজি করায়। তাতে ওর সুবিধে। প্রমাণ করা যাবে উনি মায়ের অপারেশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, উনি কটার সময় কোথায় রক্ত আনতে গিয়েছেন, ওষুধ কিনতে গিয়েছেন, সবই উনি পুলিশকে দেখাতে পারবেন, আদালতে সব ডকুমেন্ট তুলে ধরতে পারবেন, আসল উদ্দেশ্য ছিলো তাই, প্রতিটি ব্যাপারে আপনিও ওর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। একবার শুধু একটা বাজতে দশে আপনি টেলিফোনে একটাই কথা জানতে চান, 'পেয়েছো?' বসুধারা জানায়, 'পেয়েছি।' নার্স আপনাকে জিজ্ঞেস করে, 'ওষুধটা পেয়েছে বললো?' আপনি বললেন, 'হ্যাঁ পেয়েছে।'

ফুলবাগানে সাহেবের ফ্ল্যাটে বসুধারা অপেক্ষা করছিল, আপনি এলেন সাতটার সময়।

'দুপুর থেকে কি করলে?'

'চীনে খেলাম। মদ খেলাম। সিনেমা দেখলাম।'

'ওটা কোথায়?'

বসুধারা ওর পেছন দিকে পুরোনো আমলের বিরাট ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা ব্রীফকেস দেখিয়ে দিল, তার দুদিকে দুটো ছোট নীল রংয়ের তালা।

আপনি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'একেবারে টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছেন?' সাহেব জবাব দিলো, 'ঘরের মধ্যে কোনও জিনিস লুকিয়ে রাখা যায় না।'

সুরজিৎ এর টেলিফোন এলো, 'মার অবস্থা খুব খারাপ। ওকে ছেড়ে দাও। জিনিসটা বাড়িতে রেখে হাসপাতালে চলে এসো।' আপনি বসুধারাকে ওর বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিলেন। আপনি বাড়িতে এলেন। ব্রীফকেসটা আপনার স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, 'আলমারিতে ঢুকিয়ে রাখো, আমি যাচ্ছি, রাত্রে নাও ফিরতে পারি. সুরজিৎ এর মার অবস্থা খুব খারাপ।' রাত এগারোটা পাঁচে সুরজিৎবাবুর মা মারা গেলেন। ভোর সাড়ে চারটের সময় আপনারা ডেডবডি নিয়ে বেরোলেন। ইলেকট্রিক চুল্লির সামনে পরপর কটা বডি ছিল। আপনাদের কাজকর্ম সারা হোতে তাই দেরি হলো। আপনি বাড়ি ফিরে একটা ঘুম দিলেন। রাত আটটার সময় সুরজিৎ

এর বাড়িতে এলেন। সুরজিৎ বেরোলো না। ওর কয়েকজন আত্মীয়জন ঘরে ব'সে ছিল। আপনি আর সুরজিৎ দোতলার ঘরে গিয়ে বসলেন।

'সোমবার দুপুরে চলে যাবে?'

'তার আগে কি করে হবে? কাল তো ও আসছে না। রবিবার সকালে আসছে রবিবার যাওয়ার অসুবিধে আছে। সোমবার দুপুরে চলে যাবে।'

'তাহলে রোববার ওটা পৌঁছে দি?'

'ও ট্রেনে ওঠার আগে পৌঁছে দেয়া যাবে না।'

'তার মানে আবার বসুধারা?'

'হ্যাঁ, কালই এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে।'

'ওর সঙ্গে তো সেরকম কথা ছিল না। কথা ছিলো শুধু জিনিসটা এনে দেবে। তা তো দিয়েছে।'

'ও কি রাজি হবে না?'

'রাজি হয়তো হবে। কিন্তু যদি না হয়?'

'তাহলে ওকে বাদ দাও। তুমি লেকে চলে যাও।'

'মা না মেয়ে?'

'কেন? মেয়ে। প্রথমত মা দীঘা গেছে। দ্বিতীয়ত, মেয়েটা বোকা আছে। সবটা টের পাবে না।'

এসব কথাবার্তা আপনাদের চলতে থাকে। সুরজিৎবাবুকে নীচ থেকে চাকর ডাকতে আসে। আপনিও উঠে আসেন। লোকের ধারে চলে আসেন। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়। সোমবারের কাজের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন। মেয়েটি আজকের রাতটা চায়। আপনি রাজি হন না। বসুধারাকে যেমন বলেছিলেন ওকেও তেমনি বলেন। 'নেকস্‌ট্ উইক।' মেয়েটি একটা নির্দিষ্ট দিন জানতে চায়। আপনি বলেন, 'কাজটা হয়ে গেলে, সোমবারই।' আপনি খুব কালীভক্ত। রাত সাড়ে এগারোটায় মন্দিরে এলেন। দিঘির পাশে মন্দিরের দুটো গেট বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি ঘুরে গেলেন। সেদিকেও দরজা বন্ধ। পাঁঠা বলির জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে মূল মন্দিরের বন্ধ দরজায় প্রণাম জানালেন।

শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই আপনার মনে হলো মেয়েটি সত্যিই বোকা। লাস্ট মোমেন্টে গুবলেট করে দেবে। আপনি সুরজিৎ এর কাছে এলেন। ওকে বোঝালেন মেয়েটা পারবে না, আপনার মনে হচ্ছে। বসুধারাকেই ব'লে দেখা যাক। বসুধারা রাজি হলে ওকে বারণ ক'রে আসবেন। না হলে যা আছে তাই থাকবে। সুরজিৎবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। তাই হোক।' শনিবার দুপুরে বসুধারাকে নিয়ে আপনি পার্ক স্ট্রিটে এলেন আপনার পরিচিত বার-এ। সেখানে বসে বসুধারাকে বোঝালেন। বসুধারা রাজি হয়ে গেল। বিনিময়ে নেকস্‌ট্ উইকে আরও একটা রাত এক্‌সট্রা চাইল। আপনি রাজি হলেন। সন্ধেবেলা লেকের ধারে মেয়েটিকে এসে জানালেন, আপাতত তোমাকে দরকার লাগছে না।

গত চার মাসে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনি কটা কথা বলেছেন? আজ রবিবার। যান, বউকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখে আসুন। আর শুনুন, আপনার পাড়ায় উমাশঙ্করের পানের দোকানে হনুমানজীর একটা ফোটো আছে, সেই ফোটোর পেছনে একটা ছোট ড্রয়ারে একটা কৌটোয় আপনার সাতটি হিরের আংটি ছিল, সেই কৌটো আমরা নিয়ে এসেছি। যান, গিন্নিকে নিয়ে একটু ঘুরেটুরে আসুন, বেশি দূরে যাবেন না। বুঝতেই পারছেন দূরে যাবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। আপনার আজকের দিনটাই সত্যিকারের দিন। কাল দুপুরে আপনাকে এ্যারেস্ট করা

হবে। অতএব আজকের দিনটাই শেষ দিন। আসুন।

হীরেন মিউজিয়ামের পাশ দিয়ে হেঁটে আসে। অজস্র গাড়ি চলেছে। হীরেন একটু দাঁড়ায়। রজনীগন্ধা নিয়ে কিছু লোক গাড়িগুলো থামলেই ছুটে যাচ্ছে। এ অঞ্চলে গোলাপ চাঁপা রজনীগন্ধা যে কোনও ফুল দেখলেই হীরেনের বিরক্ত লাগে। হীরেন ভাবে তার স্ত্রীর কথা। সত্যিই গত চার মাসে দিনে একটা দুটোর বেশি কথা, একটা দুটো 'হুঁ না' ছাড়া সে আর কিছু বলে নি। অথচ চারমাস আগে সে ছিলো সব চেয়ে সুখী মানুষ। কেবল স্ত্রীকে ভালোবাসা সত্ত্বেও অফিসের বসুধারা মেয়েটির জন্যে তার দুর্বলতা ছিল। গত চারমাসে মিনু কতোবার বলেছে এন্টার দি ড্রাগনটা দেখে আসি চলো অথচ তার সময় হয়নি। মিনুকে সময় দিলে এসব হোতো না। মিনুর সঙ্গে থাকলে কলামন্দিরের কাছে ওই বাড়িটায় যেতে হোতো না। সুরজিৎ কি করে যে তার মধ্যে এভাবে ঢুকে গেল সে নিজেই টের পায় নি। এই চারটে মাস যেন চারটে দিনের মতো ফুরিয়ে গেল।

এবং গত সাতদিন তার পেছন পেছন প্রত্যেকটি মিনিটে ঘুরছে কেউ না কেউ। অথচ সে মুহূর্তের জন্যে টের পায় নি।

হীরেন বাড়ি আসে।

ঘরে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে যায়। শাওয়ার খুলে সাবান মেখে শ্যাম্পু মেখে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে। স্নান ক'রতে ক'রতেই ভেবে ঠিক ক'রে নেয় মিনুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। আজকের দিনটা বাইরে কাটাতে হবে। আজ রাত্তিরে মিনুকে সুখ দিতে হবে, সুখ চাইতে হবে মিনুর কাছে। মিনুর কাছে ও যা চাইবে তাই তো মিনু ওকে দেবে। আজকের রাতটা আমাদেরই রাত মিনু। একটা বাংলা ছবির গান মনে পড়ে হীরেনের 'এই রাত তোমার আমার।' হঠাৎ আলো নিবে যায়। অন্ধকারে হঠাৎ কেমন যেন তার ভয় করে। কোনওরকমে বাথরুমের দরজাটা খোলে হীরেন। খুলেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে দ্যাখে আলো। একটা মোমবাতি হাতে মিনু দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্যেই আলোটা এনেছে। কিন্তু চিৎকার ক'রে ওঠে হীরেন, 'কে, কে তুমি?' মিনু বলে, 'আমি মিনু।

'তুমি এখানে কেন?'

'তোমার জন্যে আলো এনেছি।'

'কে বলেছে আনতে?'

'কেউ বলেনি, আমিই এনেছি। কেন কি হয়েছে?'

'কিচ্ছু হয় নি। কিন্তু তুমি আমাকে ফলো করছ কেন?'

'কী বলছো তুমি, তোমার কি মাথা খারাপ হোয়ে গেছে?'

'আমার মাথা ঠিক আছে মিনু, ঠিক আছে। কিন্তু ওদের মতো তুমিও আমাকে ফলো করছ আমি জানি।'

'কাদের মতো?'

'তাদের তুমি চিনবে না। গত সাতদিন ধ'রে কিছু লোক আমার পেছন পেছন ঘুরছে। তুমি, তুমিও ঘুরছো।'

'আমি তো গত সাতদিন ঘরের বাইরে কোথাও যাইনি।'

মোমবাতিটা জ্বলতে থাকে, গলতে থাকে মিনুর হাতে।

রূপকথা

পোস্টমর্টেম করতেই হবে।

অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হয়। যেহেতু দুর্ঘটনা, যেহেতু হাসপাতালে ভর্তির সময়ই পুলিশ কেস রয়েছে, অতএব এখন পুলিশকে না জানিয়ে বডি দেওয়া যায় না। ওরা থানায় জানিয়েছে। খবর আসে পোস্ট মর্টেম করার পর বডি ছাড়া হবে।

বাড়ির পেছনের লোহার সিঁড়ি দিয়ে স্বর্ণলেখা ছাদে উঠেছিলেন। তিনি ছাদে যান না, ওই সিঁড়ি দিয়ে কখনও যান না। একটা পুরোনো টিনের চাল, বোধহয় কখনও ঝড়ে উড়ে এসে আটকে ছিল ওখানে, ও-সিঁড়িটা কখনও ব্যবহার করা হয় না, তাই ওটা নামানোর কথাও কখনও ভাবা হয়নি।

একটা শব্দ শুনে নাকি অবিন বেরিয়ে এসেছিল। স্বর্ণলেখা গড়িয়ে পড়েছিলেন ওই টিনের চালে। তাঁর পিঠটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। রক্তাক্ত জিরাফের মতো ঝুলছিল লোহার সিঁড়িটা।

অবিন মাকে নিয়ে এসেছিল পি জি হাসপাতালে। গত আট দিনের মধ্যে মাত্র একবার আড়াই মিনিটের জন্য জ্ঞান ফিরেছিল, কোনও কথা পরিষ্কার বলতে পারেননি স্বর্ণলেখা, শুধু দু একটা প্রশ্নের অস্পষ্ট অপরিস্ফুট উত্তর দিয়েছিলেন, তার থেকে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। সিদ্ধান্ত দূরের কথা। ডক্টর মজুমদার বলেছেন, 'দেখে মনে হচ্ছিল জল চাইছেন, আসলে জল নয়, দুই ঠোঁটের ফাঁকে অবিন নামটা উচ্চারণ করার চেষ্টা কবছিলেন।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু।

হয় খুন, না হয় আত্মহত্যা। হাসপাতাল ছাড়বে না, পুলিশও সহজে ছাড়বে না। দয়াময়ী দত্ত রোডের ওই রাজকীয় প্রাসাদে, যেখানে এক বিধবা মহিলা, যার সোনাদানা আছে গল্পকথার মতো, সেই মহিলা থাকেন তাঁর ছোটপুত্রের সঙ্গে, সেখানে এ ধরনের একটা মৃত্যু স্বাভাবিক মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই। একটি চাকর, সপরিবারে একটি দাসী, একজন দারোয়ান, বাগানের একজন মালী, এরা থাকে বাড়ির একটা পাশে, মূল বাড়ির সঙ্গে তাদের বসবাসের যোগ নেই। তাই মা ছেলের নিঃশ্বাসের শব্দও যেখানে শোনা যায়, সেখানে এরকম একটা ঘটনা ঘটল কি করে? আত্মহত্যা করার কোনও লক্ষণ তো তেমন কিছু দেখা যায়নি। এ বাড়িতে অনেক দিন ধরে কাজ করছে শোভা, সে শুধু বলেছে, কিছু দিন ধরে মা খুব মন খারাপ করে থাকতেন, কারও সঙ্গে কথা কইতেন না।

মা'র অ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে করুণাময়ী, কাঁকুড়গাছি আর জুবিলি পার্ক থেকে ছুটে এসেছে তিন ছেলে। প্রবীণ, নবীন, রবীন, অবিন, চার ভাই, প্রায় বছর দুয়েক পর চারজনে আবার একসঙ্গে উঠছে বসছে কথা বলছে। দু বছর আগে ভাইঝি ঝুমুরের বিয়ের সময় চারভাই

একসঙ্গে কাজ করেছিল, যদিও অবিনের সঙ্গে সকলেই যে যথেষ্ট দূরত্ব রক্ষা করতে চায়, সেটা তাদের ব্যবহারে তারা নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল। অমন মুখশ্রী দেখা যায় না, তাই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পরই ঝুমুরের বিয়ে হয়ে গেল। ঝুমুরকে প্রচুর গয়না দিয়েছিল তাব ঠাম্মা। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর এই দু বছরে বড় ছেলে প্রবীণ তার মার সঙ্গে আর কথা বলেনি।

একসঙ্গেই ছিল একসময়। তিনতলা পৈতৃক বাড়ি। ছেলেদের দিন কাটতো রাজপুত্রের মতো। শুধু পক্ষীরাজ ঘোড়টাই ছিল না। তবু এ বাড়ির সুখ ছেড়ে তাদের চলে যেতে হয়েছে। কোনও বউই মেনে নিতে পারেনি শাশুড়ির দাপট। বড় অহঙ্কারী এই মহিলা। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি খুব কমই। বউদের সঙ্গে প্রায় বলেনই না।

'কথা মা চিরকালই কম বলে।'

'তাই বলে সহ্যের তো একটা সীমা আছে। সব অপমান গায়ে মেখেও এখানে পড়ে থাকতে হবে?'

'মা জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে।'

'তাই পরের মেয়েকে কষ্ট দিয়ে সুদে আসলে এখন শোধ তুলছে।'

'মা তো তোমার সঙ্গে কথাই বলে না।'

'তার কারণ তোমার মা আমাকে বাড়ির বউ তো দূরের কথা, তোমার মা আমাকে মানুষ বলেই মনে করে না। ওঁর ধারণা আমি গরিবের মেয়ে, ওঁর ধারণা ওঁর ছেলেকে ঠকিয়েছে আমার বাবা মা।'

'এসব তোমার মনগড়া কথা। মার সোনাদানা সম্পর্কে কোনও আইডিয়া আছে তোমার?'

'থাকলে কি হতো? যখের ধন পাহারা দিচ্ছে তো তাঁর ছোটপুত্র। তুমি কেন এখানে মাটি কামড়ে পড়ে আছো?'

সকলেই জানতো পুরোনো কালের একটা বিরাট আলমারিতে ঠাসা রয়েছে তাঁর বাপের বাড়ির দেওয়া সোনা হিরে মণিমুক্তো। জমিদারের মেয়ে স্বর্ণলেখা। রূপবান এক ডাক্তার যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে এত সোনাদানা পেয়েছিলেন তিনি, লোকে বলত, জমিদারের মেয়ে তো নয়, রাজার মেয়ে।

'না, আমি চাই পোস্টমর্টেম হোক।'

'কি বলছো বড়দা?'

'ঠিকই বলছি। আমি একা নয়, আমরা সবাই চাই পোস্ট মর্টেম হোক।'

'সবাই মানে?'

'আমি, নবীন, রবীন...'

'মাকে কাটাছেঁড়া করবে, এটা ভাবতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। হলেও একটা কিছু প্রমাণ তো হবে।'

'কি প্রমাণ হবে?'

'হবে মা আত্মহত্যা করেনি।'

স্বর্ণলেখা ছিলেন পরমাসুন্দরী। বর্ধমান থেকে আই-এ পাশ করেছিলেন। তাঁর বাবা চন্দ্রশেখর বলেছিলেন জামাইকে বিলেত পাঠাবেন। কিন্তু কাকে পাঠাবেন বিলেত? হাসপাতালে

নাইট ডিউটির কথা প্রথম প্রথম বুঝতে পারেননি স্বর্ণলেখা। মাস চারেক পরেই তিনি জানতে পারেন তাঁর স্বামী একটি নার্সের সঙ্গে প্রতি শনিবার রবিবার রাত্রিবাস করেন। বুঝতে পারছিলেন ফেরানো কঠিন। তবু চেষ্টা করেছেন। যখন কোনও কিছুই কোনও কাজে লাগছে না, স্বর্ণলেখা একদিন ওঁকে বললেন 'ওকে তুমি বিয়ে করো, সূর্যমুখী নিজেই তো কুন্দর সঙ্গে নগেন্দ্রর বিয়ে দিয়েছেন।'

'কে সূর্যমুখী?'

'বলে কোনও লাভ আছে তোমাকে?'

ডাক্তার শক্ত করে চেপে ধরেন স্বর্ণলেখার হাত। সোনার চুড়ির ওপর থরথর করে কাঁপতে থাকে বিনয় বিশ্বাসের মুঠো। গায়ে জোর ছিল জমিদারের মেয়ের, এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দেয় ডাক্তার যুবকটিকে। চন্দ্রশেখর এসেছিলেন মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। স্বর্ণলেখা গেলেন না। ওই বংশে কোনও মেয়ে কখনও শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে যায়নি। ওতে মান থাকে না। মানুষের মান সোনার চেয়ে দামি। প্রতি তিন বছর অন্তর একটি করে সন্তানের জন্ম দিলেন স্বর্ণলেখা, তারাই প্রবীণ নবীন আর রবীন।

নার্স পূর্ণিমা আর তার এক বছরের বাচ্চা নিয়ে শিলং গিয়েছিলেন বিনয় বিশ্বাস। চেরাপুঞ্জীর বিখ্যাত ঝরনা দেখছিলেন দুজনে। অসংখ্য ঝরনা পাশাপাশি নেমে আসছে দুরন্ত বেগে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন দুজনে। মুহূর্তের মধ্যে একটা পাহাড়ী সাপ কামড়ে দেয় পূর্ণিমাকে। ছেলেটি ছিল তার কোলে। তক্ষুনি শিলং-এর হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হলেন বিনয়। চেরাপুঞ্জী থেকে শিলং শহরে মোটরে আসতেও অনেকটা সময় লাগে। ওই সময়ের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে পড়ে পূর্ণিমার সারা শরীরে। সেদিন রাত্রেই পূর্ণিমা মারা যায়। ছেলেটিকে নিয়ে বিনয় ফিরে আসে কলকাতায়।

লালবাজারের অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার চন্দন সেনগুপ্তের কাছে এসে হাজির হয় অবিন। সেনগুপ্ত বলেন, 'ডেপুটি কমিশনার একবার বলে দিলেই ছেড়ে দেবে। আমি চেষ্টা করে দেখছি। কাল বেলেঘাটায় খুব গোলমাল হয়েছে। কংগ্রেস সি পি এম দু দলেরই বহু লোকের হাত পা ভেঙেছে। একটা বস্তি থেকে পুলিশ প্রচুর বোমা উদ্ধার করেছে। ডি সি জরুরি মিটিং করছেন।'

'যেভাবেই হোক তুমি ওকে ধরার চেষ্টা করো।'

'তুমি চলে যাও। অতো ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি দেখছি কি করা যায়।'

কলকাতায় ফিরে বিনয়ের উচ্ছৃংখলতা আরও বেড়ে যায়। যথেচ্ছ অত্যাচার চালাতে থাকেন তাঁর স্ত্রীর ওপর। বলেন, 'তোমার অভিশাপে পূর্ণি মরেছে। এই ছেলের যদি কিছু হয় তোমাকে আমি খুন করে ফেলব।' ছেলেটির জন্যে আয়া রাখা হলো। অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখা হল অবিন। পূর্ণিমার মৃত্যুর পর বিনয়ের পসার বেড়ে গেল। তিনি বুঝলেন, সবটাই তাঁর এই ছেলের ভাগ্যে। ডাকাতের থলের মতো ভরে গেল ডাক্তারের থলে। কই, স্বর্ণর তিন তিনটে ছেলের জন্মের পর তো এরকম হয়নি। ভাবলেন, স্বর্ণলেখার সোনাদানার তেজ এবার কমবে। স্বর্ণলেখা তিন সন্তানকে নিয়ে কাটাচ্ছিলেন অসহ্য দিনগুলি। ফিরেও তাকাতেন না পূর্ণিমার ছেলের দিকে। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে দেখলেন, আয়ার ঘর থেকে

ছেলেটি চলে এসেছে। তখন তার বছর আড়াই বয়স। স্বর্ণলেখার খাটে তাঁর পাশে ছেলেটি ঘুমোচ্ছে অঘোরে। সেই থেকে ছেলেটি তাঁর কাছেই মানুষ। সন্ধের পর বিনয়ের সঙ্গী বিলিতি মদ। নেশাগ্রস্ত বিনয় স্বর্ণলেখার মুখে দেখতে পান পূর্ণিমার মুখ, তাই কিছু আর বলেন না।

'আমি ছাড়া কেউ তো থাকে না এখানে, তাহলে মাকে আমিই খুন করেছি?'

'তুই কেন? খুন যে কেউই করতে পারে।'

'মা খুন হয়েছে এটা যদি প্রমাণ হয়, তাহলে ধরতে হবে আমিই খুন করেছি।'

'হাসপাতাল বলছে বডি দেবে না, পুলিশ বলছে পোস্ট মর্টেম করতেই হবে, তুই বাধা দিচ্ছিস কেন? আমরা যদি নির্দোষই হই, ডি. সি.কে ধরার জন্যে এত চেষ্টা করতে যাবো কেন?'

অবিনের মনে পড়ে স্বর্ণলেখা একদিন বলেছিলেন, বাপের বাড়ি গিয়েও কি আমি সুখ পেতাম? বিয়ে হয়ে যাবার পর বাপের বাড়ি আর মেয়েদের বাড়ি নয়। তাছাড়া সেখানে আমার দাদা বউদিরা আছে। জমিদারের রক্ত ভালো রক্ত নয় রে। তারা কোনও সময়ই ভুলতে পারতো না, আমি তাদের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে এসেছি। আমার স্বামী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এই সুযোগটা ওরা নিত। মেয়েদের জীবনে এর চেয়ে বড় অপমান কিছু নেই। তাছাড়া মানুষ বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র কোনও আশ্রমে চলে যেতে পারতাম।

'এখনও তো যেতে পারো।'

'তুই আমাকে চলে যেতে বলছিস?'

'বলছি না। সারা জীবন সংসারে তো পেলে শুধু যন্ত্রণা, কি লাভ এটা আঁকড়ে থেকে?'

'তোকে দেখবে কে?'

'আমাকে আমিই দেখব।'

'পারবি না তুই। ভগবান আমার ছেলেদের শরীরে দয়ামায়া কিছু দেননি। ওই বাপের ছেলে তো।'

'ওই বাপের ছেলে তো আমিও।'

স্বর্ণলেখা আর কিছু বলতে পারেন না।

প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার, নবীন চাটার্ড, রবীন জিওলজিস্ট। তিনজনেরই অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। এ বাড়িতে এক এক জন তাদের মা'র সংসার থেকেই যে শুধু আলাদা হয়েছে তা নয়, তিন বছরের মধ্যে তিন ভাই একে অন্যের সংসার থেকে সরে গেছে। মৃত্যুর পূর্বে জীবনে একটি কাজ করে গিয়েছিলেন বিনয় বিশ্বাস। বাড়িটা লিখে দিয়েছিলেন স্ত্রীর নামে। ওই বাড়িতে বউরা কেউ থাকতে চায়নি। শাশুড়ির সঙ্গে যেমন তাদের তিক্ত সম্পর্ক হয়েছে, তেমনি এক বউয়ের সঙ্গে বনিবনা হয়নি অন্য বউয়ের। সকলেরই একই রকম দম্ভ, একই রকম ঈর্ষা।

অবিন তাদের মায়ের পেটের ভাই নয়। তবু অবিনই যেহেতু জানে মার সব সোনাদানার কথা, অবিনের ওপরই যেহেতু মার অন্ধের মতো ভালোবাসা তাই অবিনের ওপর অন্য তিন ভাইয়ের রাগ জমতো, সে রাগ গোপন থাকতো না। বউরা তাদের স্বামীদের বোঝালো, মা তাঁর সোনাদানা হিরে মুক্তো সব দিয়ে যাবেন অবিনকে, তার বউকে। সে বউ এলে এক মুহূর্ত আর এখানে থাকা যাবে না। তার চেয়ে চলো এখনই চলে যাই।

জয়পুরী পাথর বসানো চারটে বাক্সে প্রচুর গয়নাগাটি আছে। প্রতিটি বাক্সের ওপর ঝিনুক

দিয়ে খোদাই করা আছে চার ছেলের নাম। কিন্তু বাক্সগুলো দিয়ে যাননি স্বর্ণলেখা। এখন সে আলমারির চাবিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘাসের ওপর একলা বসে ছিল অবিন।

দূরে বেঞ্চের ওপর একসঙ্গে বসে থাকা তিন ভাইয়ের মনের মধ্যে তখন সন্দেহ নিশ্চিতভাবে দানা বাঁধছে। চাবিটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যে সরিয়েছে সেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে ওই সিঁড়ি থেকে। লোহার সিঁড়ি দিয়ে কোনওদিন ওঠেনি স্বর্ণলেখা। তিন ভাই সর্বক্ষণ লেগে লেগে থাকল অবিনের সঙ্গে। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সময় কেউ না কেউ অবিনের পেছনে এসে দাঁড়াল। কড়া নজর রাখা হলো প্রতি মুহূর্তে।

বডি চলে গেল। পোস্ট মর্টেম শেষপর্যন্ত করতেই হলো।

'একটা কথা রাখবি আমার?'

'কি কথা?'

'আমি মরে গেলে আমার মুখাগ্নিটা তুই করিস।'

'তোমার বড় ছেলে মানবে কেন? আমি তো তোমার পেটের ছেলে নই। তাছাড়া মুখাগ্নির অধিকার তো বড় ছেলেরই।'

'গত জন্মে তুই-ই ছিলি আমার বড় ছেলে।'

'সেটা এ জন্মে কেউ মানবে কেন?'

'আর কিছু তো চাইনি তোর কাছে। একটু আগুন চেয়েছি।'

স্বর্ণলেখার কাটা ছেঁড়া দেহটা জোড়া দিয়ে নিয়ে আসা হলো শ্মশানে। যে মুখে অনেক যন্ত্রণা লুকিয়ে রেখেছিলেন স্বর্ণলেখা, সে মুখটা এখন আরও বিকৃত।

বড় ভাই প্রবীণ, ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে দেখেছিল সে অবিনকে। নবীন আর রবীনের চাপে পড়ে সেও সন্দেহ করেছে। কিন্তু দ্বিধা ছিল। দ্বিধাটা সম্পূর্ণ কেটে গেল যখন মার বডিটা শ্মশানে নিয়ে আসা হলো। অবিনের চোখে মুখে অপরাধ জমেছিল। তার চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। কি করে সম্ভব এটা? তারা তিন ভাই মার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। অবিনই তো ছিল শেষ পর্যন্ত। ভাইদের কাছ থেকে মাকে সে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। সে কি করে এত শক্ত থাকে?

শ্মশান থেকে বড় গঙ্গা। সেখান থেকে বাড়ি। ক্লান্ত সকলে।

এক এক তলায় ছ সাতখানা করে ঘর। একতলা দোতলায় সব ঘরে তালা ঝুলছিল। তিনতলায় একদিকে থাকতেন স্বর্ণলেখা, অন্যদিকে অবিন। প্রবীণ নবীন রবীন চার পাঁচ দিন আগে তাদের বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে এসেছে। ওরা সকলে রয়েছে তিনতলার ঘরগুলোতে। তিনতলায় প্রত্যেকটি ঘরের মাঝখানে অনেকখানি করে ফাঁকা জায়গা। দোতলায় দু তিনখানা ঘর দিন সাতেক আগে খুলে দেওয়া হয়েছে। মাঝখানে একটা বিরাট হলঘরে অবিন একা বসে থাকে একটা চেয়ারে।

প্রবীণের মেয়ে জামাই ঝুমুর আর আকাশ দিল্লি থেকে আসতে পারেনি, কাজে আটকে গেছে। প্রবীণের স্ত্রী আরতির শরীর খারাপ লাগছে। দরজা খুলে প্রবীণ বেরিয়ে আসে। রবীনের ঘরের দরজা খোলা ছিল।

'মিনু কোথায়?'

'ঘরে। ওর শরীর খারাপ লাগছে।'

'আরতিরও। কি করা যায় বল তো?'

'আগে মেজদাকে দেখে আসি চলো।'

ওরা নবীনের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে ঊর্মি।

'দাদা এ ঘরে আমি থাকতে পারবো না।'

'কেন কি হয়েছে কি?'

'ওই দেখুন না, ঘরের আলো কিরকম কমে আসছে।'

সবাই ঘরের আলো, বারান্দার আলোর দিকে তাকায়। আলো সত্যিই কমে আসছে। আরতি তার ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। ঊর্মির খাটের ওপর ঘুমোচ্ছে তার মেয়ে আর রবীনের ছেলে। একমাত্র ঘুমন্ত মানুষেরই কোনও ভয় থাকে না। আরতির গায়ের পাশে এসে দাঁড়ায় ঊর্মি।

'চলো দিদি আমরা নীচে চলে যাই।'

'নীচে কোথায়?'

'দোতলায় অবিনের ঘরে। ও হলঘরে একা বসে আছে। ওখানে আমরা সবাই একসঙ্গে থাকবো।'

ঘুমে ঢুলে পড়া ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে সবাই গায়ে গা ঠেকিয়ে লম্বা বারান্দা পার হয়ে নেমে আসে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। সকলে এসে ঢোকে অবিনের ঘরে। এখানেও সব আলো যেন নিবে আসছে। অবিন কিছু বুঝতে পারার আগেই বারান্দার অস্পষ্ট আলোয় একটি মহিলার শরীর দেখা যায়। অবিনের গলা কেঁপে ওঠে, 'কে?'

'আমি বাবু।'

'আমি কে?'

'আমি শোভা।'

'তুমি এখানে কেন?'

'যেদিন মা সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন, সেদিন ভোরবেলা মা আমাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, এই গাছের নীচে মাটির তলায় চাবিটা রাখছি, আমাকে পুড়িয়ে শ্মশান থেকে ওরা ফিরে এলে, চাবিটা তুলে নিয়ে বড়বাবুর হাতে দিয়ে দিবি। চাবিটা বিকেলেই তুলেছিলুম। এই নাও বাবু...।'

সে-চাবির জন্যে বড়বাবু মেজোবাবু সেজোবাবু কেউ হাত বাড়াতে পারে না।

মানুষের দেহ পচে যাওয়া বিশ্রী গন্ধ আসছে। মানুষের দেহ পচে যাওয়া গন্ধ এসে লাগছে সকলের হাতের আঙুলে, পায়ের পাতায়, মাথার চুলে, চোখের মণিতে, নাকে মুখে জিবে এসে লাগছে কাটা ছেঁড়া মানুষের বীভৎস গন্ধ।

ত্রিসীমানায়

হাসপাতালে গেটের দুপাশের গাছ থেকে ভোরবেলার বৃষ্টিভেজা ফুলের গন্ধ আসছিল সকাল নটায়। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে যুথিকা আর অশ্বিনী। যুথিকার তিপ্পান্ন, অশ্বিনীর চোদ্দ। ওর বাবা রমেনের বাড়িওয়ালি যুথিকা। তাঁর গায়ে মাথা এলিয়ে দাঁড়াতে ওর কষ্ট হচ্ছিল না। রমেন ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে আনে ওদের সামনে। দুজনের মাঝখানে বসে অশ্বিনী। আপাতত হাসপাতাল থেকে বাড়ি যেতে পারছে এতেই অশ্বিনীর শরীরটা যেন জুড়িয়ে যায়। ঠাণ্ডায় কেমন শান্ত হয়ে আসে।

জুড়োয় না রমেনের। ট্যাক্সির ভাড়াটা তো সে দেবে না, দিতে পারবে না। ডাক্তার বলেছে কী হয়েছে অশ্বিনীর। রমেন তার সর্বস্ব খুইয়েছে এতদিন। নিজের মস্তিষ্ক যতরকমভাবে পেরেছে সে ব্যবহার করেছে। মেয়ের চিকিৎসার জন্যে একটা সময় যখন তার সামর্থ্য শেষ হয়ে এলো, যুথিকাকে সে দিদি ডাকে, দিদির কাছেও তাকে হাত পাততে হয়েছে। পাততে হয়েছে কথাটা ঠিক নয়, দিদিই তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি। আজ হাসপাতালে আসার পথে দিদি বলেছেন, 'তোমার সুদিন আবার ফিরে আসবে রমেন। তখন সব একসঙ্গে শোধ করে দিও। শুধু অশ্বিনীর জন্যে যা করছি সেটা আমায় করতে দাও। ওটা কখনও ফেরত দেয়ার চেষ্টা কোরো না।' রমেন বলে, 'ওটা যে ফেরত দেয়া যায় না সে আমি জানি দিদি।'

পনের বছর আগে মারা গেছে যুথিকার স্বামী। একতলায় তিনখানা ঘর খালি হয়ে গেল। পর্ণশ্রীতে বাড়ি করে সুধীর মজুমদার দয়াময়ী সদ্য বিধবার হাতে একতলার চাবিটি দিয়ে দিলেন। দোতলায় যুথিকা একা রয়েছেন নির্মলাকে নিয়ে, যে তাঁকে রেঁধেবেড়ে খাওয়ায় তাঁর স্বামী যাকে নিয়ে এসেছিল চাকুলিয়া থেকে। স্বামীর মৃত্যুর চেয়েও এক ভয়াবহ শূন্যতা নিঃশব্দে উঠে আসে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে। সেই সময় একদিন এসেছিল রমেন, তখন মাত্র চারমাস আগে তার বিয়ে হয়েছে।

'ফুলশয্যার রাত্তিরে আপনার স্বামী আপনাকে বলেছিল আমি যদি মাত্র দশ বছর বাঁচি তুমি আমাকে ভালোবাসবে?' রমেনের কথা শুনে চমকে উঠেছেন যুথিকা। তাঁর স্কুলে ইংরেজি পড়ায় ঋতুপর্ণা। তার আত্মীয় রমেন একটা বাড়ি খুঁজছে, জ্যোতিষচর্চা করে, সেটাই পেশা, অসাধারণ ক্ষমতা। কিন্তু ঋতুপর্ণা জানতো ওই বাড়ি পেলেও ভাড়া দেয়ার সাধ্য তার নেই। ঋতুপর্ণাকে তিনি বলেছিলেন, তোমার আত্মীয়, চেনা লোক, লোকটাকে পছন্দ হলে ভাড়ায় আটকাবে না। কমিয়ে দেবো। আমার দরকার একজন ভালো মানুষ।

কিন্তু এ কথা তো ঋতুপর্ণা কেন, কেউ জানে না। জগতের কেউ জানে না। কী বলছে লোকটা? এমন অসম্ভব কিছুও কি বিশ্বাস করা যায়? এ কি ওর কোনও অলৌকিক শক্তি, নাকি যুথিকার মুখের মধ্যেই এতকাল পরে ধ্বনিত হচ্ছে সেই প্রশ্নটা, ফিরে এলো সেই কণ্ঠস্বর? যুথিকা ঠিক শুনছেন তো? নিজেই নিজেকে বলছেন না তো?

· 'আমি কী বলেছিলাম বলতে পারেন?'

'দশ বছর একটা মানুষকে ভালোবাসতে পারা কি কম?'

রমেনের প্রভায় কি যুথিকা আচ্ছন্ন? মানুষের মধ্যে এই সর্বব্যাপিত্ব আসে কোত্থেকে? মানুষ কি মানুষের কাছে এমন করে গোপন কোনও সত্যকে উন্মোচন করতে পারে? তাঁর কিংবা তাঁর স্বামীর ছক ওতো রমেনের কখনও দেখতে পাবার কোনও কারণ নেই। যুথিকাকে তো সে দেখছে এই প্রথম। করকোষ্ঠী অধ্যয়নের কোনও সুযোগ ঘটেনি। দুই চোখ আনত করে যুথিকা। ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ এমন নখদর্পণে! এক অলোকসামান্য দ্যুতিময় মর্মস্থলের নিকটে স্থির হয় যুথিকা।

যুথিকা একবারও ভাবেননি লোকটা ভাড়া দিতে পারবে তো।

একতলায় সামনের যে বড় ঘর সেখানেই তখন লোকজন আসতো সকাল-সন্ধ্যা। একেবারে নির্ভুল গণনা। কোনও মিথ্যে নয়, ছলনা নয়। যা তার গণনায় নিশ্চিত যা অভ্রান্ত তাই সে বলেছে। কোনও দুর্বলতাকে আরও অসহায় করতে চায়নি। দিন কাটছিল আনন্দে খুশিতে।

একদিন হঠাৎই রমেন আবিষ্কার করে ঠিকুজি কোষ্ঠী নিয়ে কেউ আসছে না। কোষ্ঠী বানাতে কেউ আসছে না। কেউই যেন কিছু মেলাতে চায় না। সকলের সব কিছু মিলে যাচ্ছে। যে শ্রেণীর মানুষ তার সামনে এসে বসেছে উদ্বিগ্ন মুখে, সে মানুষের কপালে চোখেব তলায় দুশ্চিন্তার মেঘলা বিকেলগুলো এখন আর সে দেখতে পায় না। মাতৃদুগ্ধ কি শিশুরা এখন আর পান করে না? শিশুরা কি দুধ খায় সোনার চামচে? তা না হলে এমনটা হলো কী ক'রে? কী দুঃসহ দিনরাত্রির ভিতর দিয়ে চলেছে সে।

মানুষের জীবনে কী ঘটতে চলেছে মানুষ নিজেই জেনে যাচ্ছে। আগামী দিনগুলো কেমন করে কাটাবে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ তার হিসেব নিকেশ করেই এখন চলে। নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নেয়ার কাজে ও পরিকল্পনায় তারা অনেক বেশি আত্মনির্ভরশীল।

ছেলেটা পরীক্ষায় পাশ করবে কি না, জমির মামলাটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কাজুবাদামের জঙ্গলটা কেনা কি ঠিক হবে এখন, দশবছর হয়ে গেল ছেলেমেয়ে আর কি হবে না—কেউ কিচ্ছু জানতে চায় না। ধার জমে জমে গলা অব্দি ধার, কে কবে একটা ধারালো অস্ত্র বসিয়ে দেবে। এরকম একটা সর্বনাশা চিন্তা কেন তার মাথায় ঢুকছে যে অশ্বিনী ধীরে ধীরে নীল হয়ে যাচ্ছে। যে নির্লজ্জ দারিদ্র্য তাকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে তা সহ্য করার একটাই কারণ, সে কারণ অশ্বিনী।

রোজ সকালে গোবিন্দ বিশ্বাসের দোকান থেকে গরম জিলিপি নিয়ে আসতো রমেন। তার মেয়ের সবচেয়ে প্রিয় খাবার। সে মেয়ে এখন কিছুই খেতে চায় না। খেতে পারে না। সেদিন গোবিন্দর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তার ইচ্ছে করছিল বিরাট একটা থালায় শালপাতার ওপর সাজিয়ে রাখা জিলিপির ওই ভাগুটা টেনে নিয়ে এসে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কেন জিলিপি ভাজবে ওরা? ওরা কি জানে না অশ্বিনী এখন আর জিলিপি খেতে চায় না।

ওর কোনও ডাকনাম নেই। রমেন বলে, অশ্বিনী ডাকলে ওকে সম্পূর্ণ কাছে দেখা যায়। অশ্বিনী ডাকলে ওর চুল ওর হাসি, ওর কথা বলা, ভাত খাওয়া, স্নান করা, অঙ্ক করা, ইতিহাস পড়া সব একসঙ্গে রমেন দেখতে পায়। সে মেয়েটি কি আর কোনওদিন তার স্বাস্থ্য ফিরে পাবে না? সে তো কারও অনিষ্ট কিংবা ক্ষতিকর কোনও চিন্তাকে মনের মধ্যে ঠাঁই দেয় নি। তা সত্ত্বেও তারই কেন এরকম হলো? গত ছমাসে হাসপাতালের নোংরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে মেয়েটা কতো

দিনরাতই না কাটিয়েছে। ওষুধ ইনজেকশান সব কিছুর দাম দিয়েছেন যুথিকাদি।

'এত অস্থির হোচ্ছো কেন রমেন?'

'দিদি আপনি তো শোনেননি ডাক্তার কি বলেছে আমাকে।'

'কে বলেছে শুনিনি? কিন্তু তুমি তো ডাক্তারের চেয়েও বেশি কিছু বুঝতে পারো।'

'সেটা সত্যি নয় দিদি।'

'হয়তো তাই, কিন্তু ডাক্তারের চেয়ে অন্য কিছু তো জানো।'

'না। ডাক্তারের কাজ বর্তমান নিয়ে, আমি তো চেষ্টা করি ভবিষ্যৎ জানতে।'

'একটা কথা বলব আমি?'

'বলুন দিদি।'

'কাল একবার তারাপীঠ ঘুরে এসো।'

যুথিকাকে তারাপীঠ নিয়ে গিয়েছিল রমেন। এক সন্ন্যাসীর কাছে। দুবার গিয়েছিলেন যুথিকা। তাঁর কোনও শিষ্য নেই, মন্দির নেই, আশ্রম নেই। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'যদি কখনও ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত বোধ করো তাহলেই এসো।' আর একটা কথাও মনে পড়ছে, 'তোমার সবচেয়ে বিপদের দিনে আমি তোমার পাশে আছি।'

যুথিকাই টাকা দিলেন।

তারাপীঠ থেকে দুদিন পরেই ফিরে আসে রমেন। অশ্বিনী জিজ্ঞেস করে, 'তুমি ভালো আছো বাবা?'

'থাকবো না কেন? আমি যাঁর কাছে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে গেলে সকলেই ভালো থাকে অশ্বিনী।'

'তাহলে আমাকে নিয়ে গেলে না কেন?'

'তোমাকে যে নেবার মতো অবস্থা নয়।'

কথাটা বেফাঁসে বলে ফেলেছে রমেন।

'কেন আমার কী হয়েছে বাবা?'

'অসুখ।'

'সে তো জানি আমি। অসুখ তো সবাইরই হয়। সেরেও তো যায়। মালারও তো হয়েছিল।'

'তোরও সেরে যাবে অশ্বিনী। যুথিকাপিসি এসেছিল?'

'না।'

'না!'

'নির্মলামাসি এসে বলে গেছে, পিসি নেই।'

আরও দুদিন ছিলেন না যুথিকা। যেদিন দুপুরে এলেন, একতলায় নেমে রমেনের সঙ্গে দেখা করলেন না। অশ্বিনীর খবর নিলেন না, তাকে দেখে গেলেন না। এরকম তো কোনওদিন হয়নি। যুথিকাদির মনের মধ্যে কি কোনও সন্দেহ ঢুকেছে? কোনও দ্বিধা? কোনও দুশ্চিন্তা কোনও হতাশা কোনও অনুশোচনা ভুলভ্রান্তি? যুথিকাদি তার শেষ ভরসা। তিনি বাড়ি ফিরলেন দুপুরে, রাত এগারোটা বেজে গেল, অশ্বিনীকে দেখতে একবার নীচে নামলেন না এটা কেমন করে হয়? কোথায় গেছিলেন তিনি? তাঁর বোন বীথিকার বাড়ি ছাড়া আর কোথাও তো যুথিকাদি যান না। বীথিকার বাড়ি গিয়েও তিনি থাকেননি কোনওদিন। বীথিকারা কতো বলেছে তাকে। কয়েকটা দিন তাদের বাড়ি গিয়ে থেকে আসতে। যুথিকাদি তাঁর ওই ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও

কখনও রাত্তিরে ছিলেন তার মনে পড়ে না। আর সেজন্যেই বীথিকার একমাত্র কন্যা শান্তা যাকে অশ্বিনীর মতোই ভালোবাসে যুথিকা সে কখনও এসে থাকেনি তাঁর কাছে। অশ্বিনীকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকার মধ্যে তার খেয়ালই হয়নি যে বীথিকা অনেকদিন হয়ে গেল এ বাড়িতে আসেনি।

নাকি যুথিকার নিজেরই শরীর খারাপ হলো?

পরদিনও যখন সারাদিনে নীচে নামলেন না, রাত্তিরে রমেন নিজেই উপরে উঠে এলো। যুথিকাদি বসেছিলেন একটা চেয়ারে। তেমন জরুরি কোনও দরকার না হলে রমেন ওপরে ওঠে না।

'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম রমেন।'

'আপনার কি শরীর খারাপ দিদি?'

'নাতো।'

রমেন জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলো না, নীচে এলেন না কেন? অশ্বিনীর কাছেও এলেন নাতো। তাই সে অন্য কথা বলে, 'দরজা খুলে আজও বসেছিলাম। কেউ এলো না দিদি।' যুথিকা চুপচাপ বসে থাকে। বোঝা যায় তিনি অন্য কিছু ভাবছেন। রমেন তাই জানতে চায়, 'কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?' এবারে খুব বিচলিত দেখায় যুথিকাকে।

'আমাদের খুব বিপদ রমেন।'

'আমাদের মানে?'

'বীথির, ওর স্বামীর, শান্তার।'

'সে কি, কী হয়েছে ওদের?'

'বলব, তার আগে বলো তুমি আমাকে একবার তারাপীঠ নিয়ে যাবে?'

'তারাপীঠ...' রমেন কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করে।

'হ্যাঁ সন্ন্যাসীর কাছে। বীথিকে নিয়ে আমি একবার ওঁর কাছে যাবো।'

'শান্তা যাবে না?'

'আমি বললে শান্তাও যাবে। কিন্তু আমি চাই না ও যাক। শান্তার ওপরে ওর বাবা মার যে জোর নেই সেটা আমার আছে। আমি ওকে যা করতে বলব তাই করবে। তবু একটা কথা আমি ওকে কিছুতেই বলতে পারছি না।'

'কী কথা?'

'তার আগে বলো আমাকে নিয়ে যাবে?'

'ছি ছি আপনি এভাবে বলছেন কেন? আপনার কথা অমান্য করলে আমার যে পাপ হবে দিদি। কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে তো যাওয়া যাবে না।'

'কেন? তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ওনার?'

'হয়েছে। তার পরদিনই উনি চলে গেছেন। কোথায় যাচ্ছেন তিনি জানেন না। বলেছেন, সামনের বছর আবার এইসময় একবার খোঁজ কোরো।'

যুথিকা জানান ওদের বিপদের কথা।

মুকুল ছিল শান্তার বন্ধু। ওরা একসঙ্গে জুলজি অনার্স নিয়ে পড়তো। বীথি আর প্রশান্ত দুজনেই ওকে খুব পছন্দও করতো। পার্ট টু পরীক্ষা হয়ে যাবার কয়েকদিন পর ওরা ওদের আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দমদমে একটা বাগানবাড়িতে গিয়েছিল পিকনিক করতে। প্রশান্তই

দুটো গাড়ি জোগাড় করে দিয়েছিল। ওরা আটজন। দুটো গাড়িই যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও মুকুল ওর বাবার গাড়িটা নিয়ে যায়। দুজন ড্রাইভার দিয়েছিল প্রশান্ত। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর দুই ড্রাইভারের সঙ্গে মুকুল ওদের চেয়ে অনেক ভালো গাড়ি চালায়, অনেক স্পিডে গাড়ি চালায় এ নিয়ে তর্ক করতে করতেই ঠিক হয়ে যায় কম্পিটিশনের, মুকুল বাজি ধরে। দুটো গাড়িতে দুই ড্রাইভার ছাড়া সাতজন। আর একটা গাড়িতে মুকুল একা। শান্তা ওর পাশে বসতে চাইল। মুকুল রাজি হলো না। শান্তা বলল, তাহলে আমি কোনওটাতেই উঠব না। মুকুল ওকে বোঝায়, ওই গাড়িতে উঠে যদি যেতে পারো তাহলেই বুঝব তোমার সাহস আছে। তাহলে ফেরার পথে শুধু তোমাকেই পাশে বসিয়ে নিয়ে যাবো, মানে সেই যোগ্যতা তুমি অর্জন করবে।

মুকুলের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করল। হাঁটুর তলা থেকে দুটো পা-ই ওর কেটে বাদ দিতে হলো। এম.এস.সি পাশ করে রিসার্চ করছে শান্তা। ওই দুর্ঘটনার পর মুকুলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব তো নষ্ট করে দিতে পারে না বীথি! তাই দিনের পর দিন মুকুলের কাছে ওকে যেতে দিয়েছে। কিন্তু যে ছেলের দুটো পা-ই বাদ হয়ে গেছে সেই ছেলেকেই সে বিয়ে করতে চাইবে এটা স্বপ্নেও ভাবেনি বীথি।

এতক্ষণ শোনার পর রমেন কথা বলে, 'এ ঘটনা তো আপনি আমাকে কখনও বলেননি দিদি।'

'আমার যে মনে মনে একটা ভয় ছিল, তাই কথাটা তুলিনি কখনও।'

'যুথিকাদি, আপনি তো বললেন আপনার কথা ও শুনবে, আপনি কেন নিষেধ করছেন না?'

'আমি নিজের মুখে এটা বলতে পারব না।'

'অথচ আপনি চাইছেন বিয়েটা না হোক।'

'হ্যাঁ। ওই ছেলেকে বিয়ে করে গোটা জীবনটা ও কাটাবে কি ক'রে?'

'কতো টাকা খরচ করবে ওরা?'

'মুকুলরা ওদের চেয়ে বড়লোক। টাকায় কিছু হবে না।'

'মুকুলকে দিতে বলিনি তো।'

'তাহলে কাকে?'

'যদি বলি আমাকে?'

রমেনের এই চেহারা কখনও দেখেননি যুথিকা। ও কি ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছে ওর পুরোনো ক্ষমতা, ওর দিব্যদৃষ্টি? এই মানুষের ইচ্ছেকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না।

'টাকাটা আপনি দিলে কিন্তু হবে না। ওদেরই দিতে হবে। নাহলে কাজ হবে না। কিন্তু আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কি সেটা?'

'ওকে রাজি করাতে হবে। ওকে মানে শান্তাকে। আপনি বলবেন, একটা জিনিস দেবো তোকে। মাত্র এক রাত্তির ওটা তোকে হাতে রাখতে হবে; মাত্র একরাত্রি। কাল গিয়ে ওকে যদি রাজি করাতে পারেন তাহলে সন্ধেবেলা ওর বাবা মাকে একবার আসতে বলবেন। আমার কাছে।'

'কতো টাকা তো বললে না।'

'আগে রাজি হোক শান্তা।'

'আমি যখন বলেছি হবে তখন সেটাই শেষ কথা।'

'যুথিকাদি আমি যে একেবারে ধুলোয় মিশে আছি। টাকার কথা আমি আপনাকে বলব কি করে? ওঁরা আসুন ওঁদেরই বলব।'

পরদিন সন্ধেবেলা রমেন বসে আছে তার সেই সামনের অফিস ঘরে। একটা বিরাট গাড়ি এসে দাঁড়ায় তার ঘরের সামনে নিমগাছের তলায়। আগে ওরা একটা অ্যামবাসাডরে আসতো। এটা নতুন গাড়ি। তিনজনেই একসঙ্গে ঘরে ঢোকে। যুথিকা ওদের বলেন, 'তোমরা কথা বলো আমি একটু ওপর থেকে আসছি।' রমেন জিজ্ঞেস করে, 'শান্তা কোথায়?' বীথিকার কান্না পায়। প্রশান্ত তার পিঠের ওপর হাত রাখে, 'তোমার চেষ্টা যা করার তুমি তো সবই করেছ। মেয়ে যদি আমাদের দিকে ফিরে না তাকায় আমাদের আর কি করার আছে। এখন রমেনবাবু যা বলছেন সেটাই শোনো। কেঁদে কী হবে?'

'শান্তা তাহলে রাজি হয়েছে?'

'দিদিকে তো তাই বলেছে।'

'আপনারা বিশ্বাস করেন ওকে?'

প্রশান্তই উত্তর দেয়, 'আমরা করি কি করি না সেটা তো আসল কথা নয়, দিদি করেন।'

'সেই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এত দাম দিয়ে জিনিসটা নেবেন?'

'জিনিসটা কী?'

'একটা শেকড়।'

'কতো দাম এর?'

'যা আপনারা দেবেন।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে এতে কাজ হবে।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে দুটো পা যার নেই, সেই মুকুলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়েতে আপনি বাধা দিতে পারবেন?'

উত্তর খুঁজে পায় না প্রশান্ত।

রমেন জিজ্ঞেস করে, 'টাকা এনেছেন?'

প্রশান্ত বলে, 'কতো লাগবে তাই তো জানি না। টাকা আপনি কাল দুপুর বারোটার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। এবারে বলুন কতো দিতে হবে।'

'দশ হাজার।'

'দশ হাজার?' প্রশান্ত তাকায় বীথিকার দিকে। দশ বিশ পঁচিশ ভাবার মতো মাথায় কোনও কাজ করছে না বীথিকার। সে শুধু চায়, যেমন করেই হোক মুকুলের কাছ থেকে ওকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। যেমন করেই হোক মুকুল সম্পর্কে ওর মনে একটা ভয় ধরিয়ে দিতে হবে।

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে, 'কাল বারোটার পরে টাকাটা দিয়ে তাহলে শেকড়টা নিয়ে যাবো?'

রমেন উঠে দাঁড়ায়। পেছনে একটা আলমারির সামনে এসে ভেতর থেকে একটা বাক্স বের করে নিয়ে আসে ওদের সামনে। বাক্সটা খুলে নিজের হাতের ওপর রাখে একটা শেকড়। 'না, আপনি শুধু টাকাটাই আনবেন। এই শেকড়টা দিদিকে আমি এক্ষুনি দিয়ে দেবো।'

যুথিকা নেমে আসেন। রমেন শেকড়টা বাক্সসুদ্ধু তার হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'দিদি, কাল সন্ধেবেলা শান্তার হাতে এই শেকড়টা আপনি পরিয়ে দেবেন। বাঁ হাতে। শুধু একরাত্রি পরলেই হবে। পরশু খুলে রাখবে। রেখে দিক ফেলে দিক যা ইচ্ছে। এই শেকড় আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার

করা যায় না।'

যুথিকা বলেন, 'আমি বুঝিয়ে বলেছি ওকে। আমি জানতাম ও রাজি হবে। কিন্তু ওর একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'পরশু রাত্তিরে ও তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবে। আর সেই রাত্তিরে আমাকে থাকতে হবে ওদের বাড়ি।'

'এর জন্যে শর্তের কি আছে? মাসির কাছে এলেই তো ও আমার সঙ্গে দেখা করত। অবশ্য মাস ছয়েক আমি ওকে দেখিনি।'

'পরশু ও আসার আগেই আমি চলে যাবো ওদের বাড়ি। সব দায়িত্ব কিন্তু তোমার।'

'আপনি কিছু চিন্তা করবেন না দিদি। আপনার সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপটা শুধু মনে রাখবেন।'

সেই তৃতীয় রাত্রিতে দুজনে মুখোমুখি। শান্তা আর রমেন।

'শেকড়টা কোথায় পেয়েছেন আপনি?'

'তারাপীঠে। একজন সন্ন্যাসী আমাকে দিয়েছেন।'

'কেন দিয়েছিলেন?'

'ভয় অসুখ অমঙ্গল থেকে মুক্তি পাবার জন্য।'

'আমার ভালোবাসার সঙ্গে এই তিনের তো কোনও যোগ নেই।'

'তোমার জন্যে তো দেননি আমাকে।'

'তাহলে কার জন্যে দিয়েছেন?'

'আমার মেয়ে অশ্বিনীর জন্যে।'

'তাকে না পরিয়ে আমাকে পরালেন কেন?'

'সেটা জেনে কি লাভ তোমার?'

দুজনে কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকার পর শান্তা জানতে চায় কী হয়েছে অশ্বিনীর। রমেনের কণ্ঠে এই বেদনা আর কেউ কখনও এই নশ্বরতায় টের পায়নি, 'যাবার আগে একবার ওকে দেখে যেও।'

'চলুন তাহলে।' রমেন উঠে দাঁড়ায়। সামনের দরজাটা বন্ধ করে। দুজন একসঙ্গে আসে অশ্বিনীর ঘরে। এ কাকে দেখছে সে? মেয়েটা তাকে চিনতেও পারছে না। ভয় অসুখ অমঙ্গলই শুধু নয় আরও কিছু যেন ছেয়ে ফেলেছে অশ্বিনীকে। রমেন জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাবছো, শেকড়টা ওকে না পরিয়ে অন্যায় করেছি? শেকড়টা কার বেশি দরকার ছিল, ওর না তোমার?' উত্তরটা জানে শান্তা। রমেনকাকুর উদ্বাস্তু মুখের ধ্বস্ত আলোর দিকে চেয়ে তা সে বলতে পারে না।

অন্তঃপুরবাসিনী

তিনতলার এই ঘরটা থেকে খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় পাশে সুইমিং পুলে সমস্ত দুপুর জলের রং বদলায়। খাঁ খাঁ দুপুরে সূর্যের আলোয় জলের রংটা মেঘলা দিনে কেমন মন খারাপ করে উদাস হয়ে যায়। ভাগ্যিস এই সুইমিং পুলটা ছিল। বিকেল চারটে থেকে মায়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাঁতার শেখাতে নিয়ে আসে। তখন জগতে কোথাও কোনও দুঃখ, কোনও কষ্ট, কোনও ব্যর্থতা আছে ব'লে মনে হয় না। শিশুরা আছে বলেই জগৎটা সুন্দর।

আজ একমাস হয়ে গেল এই ঘরটা থেকে বেরোয় নি মন্দিরা। মৃত্যুমুখী দাদুর বিছানার পাশে বসে আছে সর্বক্ষণ। নিজের খাবার খেতে শুধু দোতলায় নামে। এছাড়া মার সঙ্গেও দাদুর অসুখ ডাক্তার ওষুধপত্র এসব ছাড়া অন্য কোনও কথা তার হয় না। এই ঘরে একটা খাটে শুয়ে আছেন দাদু। পাশে একটা ছোট্ট খাটে শোয় মন্দিরা। একটা কাঠের আলমারিতে দাদুর জিনিসপত্র ছাড়া ঘরে আছে একটা বিশাল আয়না। এ আয়নাটা বছর দশেক আগে পার্কস্ট্রিটে নীলাম থেকে কিনেছিলেন শরৎ চৌধুরী। শৌখিন মানুষ ছিলেন, এরকম অনেক জিনিস কিনেছিলেন তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে। কিছুই রাখেন নি। বলতেন, 'শখের জিনিস কিনে নিজের কাছে রাখার কোনও মানে হয় না, যার ঘরে থাকবে, সে আমাকে মনে রাখবে।'

না, কেউ মনে রাখে না।

মন্দিরা দাদুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কতো লোককে কতো কিছুই তো দিলে, কেউ গিয়েছিল কাশীপুরে তোমার খোঁজ নিতে? আজ একমাস তেরো দিন এই ঘরে তোমার চিকিৎসা চলছে। কেউ তো এলো না তোমাকে দেখতে। যারা তোমার আসাম থেকে ত্রিপুরা থেকে কেরালা থেকে কেনা জিনিস দিয়ে ঘর সাজালো, একটা লোকও কেউ এলো না তোমাকে দেখতে।

সল্ট লেক-এ বাড়ি বানিয়েছেন মন্দিরার বাবা। তিনতলা বাড়ি। ওই একটিই সন্তান তাঁর। গত বছর হিসট্রি অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করার পর থেকেই মন্দিরা বাড়ি বসে আছে। আটান্ন পারসেন্ট নম্বর পেয়েও এম. এ. তে ভর্তি হলো না। ওর বাবা কমল চৌধুরী ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, পড়বে না কেন?'

'আমার ভালো লাগছে না।'

'তাহলে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করি?'

'না।'

'কেন?'

মা সুনন্দা চেনেন তাঁর মেয়েকে। স্বামীকে ডেকে আনেন তিনি পাশের ঘরে।

'কেন জোর করছো ওকে?'

'জোর কিছু করিনি তো। মেয়েকে কিছু জিজ্ঞেস করাও অপরাধ?'

'অপরাধ হবে কেন?'

'তাহলে? একটা মাত্র মেয়ে আমাদের। দেখতে শুনতে ভালো, লেখাপড়া শিখেছে, আমার টাকা আছে, সে টাকা তো আমি ওকেই দেব, অথচ সে বিয়ে করবে না?'

'করবে। নিশ্চয়ই করবে। সমস্ত জীবনটাই তো পড়ে আছে ওর সামনে। তোমার আমার ইচ্ছে অনিচ্ছেটাই শুধু চাপাতে চেষ্টা কোরো না। তাতে ওর ভালো নাও হ'তে পারে।'

'একটা বি. এ. পাশ মেয়ে এভাবে ঘরে বসে থাকবে? একটা বন্ধু আসে না একটা বান্ধবী আসে না। কিসের অভাব ওর?'

দাদুর মুখটা আয়নায় দেখা যায়।

কী সুন্দর ছিল এই মানুষটা। কী রূপ কী রং। আর এখন? 'অন্তর্জলী যাত্রা' মনে পড়ে, সীতারাম অতীব প্রাচীন হইয়াছেন...কেবল মাত্র নিষ্পলক চক্ষুর্দ্বয় মহাকাশে নিবদ্ধ, স্থির ; তিলেক চাঞ্চল্য নাই,...বৃদ্ধের দেহে দেহে কালের নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন, অসংখ্য ঘুণাক্ষর, হিজিবিজি।

দাদু শরৎ চৌধুরী তাহলে কি ধীরে ধীরে সীতারাম হয়ে যাচ্ছেন? মন্দিরা দাদুকে জিজ্ঞেস করে, 'দাদু, দেড় বছর আগে ও চলে গেল। এর মধ্যে একবারও কলকাতা এলো না? ও কি আসে নি একবারও?'

'না।'

'হয়তো এসেছিল, হয়তো আমার কাছে আর আসতে চায় না।'

'তোর কাছে ছাড়া আর কোথাও ও আসবে না।'

'দুটো চিঠি দিয়েছিল, তারপর এই এক বছরে আর একটা চিঠিও আসেনি।'

'দীপঙ্কর গেছে গবেষণার কাজে, গবেষণার মধ্যেই ডুবে আছে, কাজ শেষ হলে ফিরে আসবে।'

'আমার বিয়েতে তুমি কি দেবে দাদু?'

'এই আয়নাটা। হায়দ্রাবাদে সালারজাং মিউজিয়াম ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও এরকম একটা আয়না তুই পাবি না।'

মন্দিরাব বাবা ওর মাকে বলেন, 'আমি তখনই বলেছিলাম তোমার বাবাকে নার্সিং হোমে রাখো, টাকা যা লাগে আমি দেব।' মা উত্তর দেন 'টাকা তুমি দেবে কেন? বাকি জীবনটা নার্সিং হোমে কাটাবার মতো টাকা আমার বাবার নিজেরই আছে।'

'তা হয়তো আছে। কিন্তু এখানে থাকাতে কি হলো দেখলে তো?'

'কি হলো?'

'তোমার মেয়ে দাদুর সেবা করতে গিয়ে একমাস ওই ঘর ছেড়ে বেরোলো না। গত একমাসে আমার সঙ্গে একটা কথাও মন্দিরা বলেনি।'

'সেটা বলেনি তার কারণ ও বুঝতে পেরেছে আমার বাবার এখানে থাকাটা তুমি পছন্দ করছো না।'

'কেন ওঁর চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হচ্ছে?'

'তা হয়তো হচ্ছে না, কিন্তু সারাদিনে একবারও তুমি গিয়ে তো জিজ্ঞেস করো না, 'আপনি কেমন আছেন?'

'আমি কাজে বিশ্বাস করি, এবং কাজ করি। একথাও তোমাকে বলে দিচ্ছি তোমার বাবার

মৃত্যুর পর তোমার মেয়ের মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে।'

সেই রাত্তিরেই মরে গেলেন শরৎ চৌধুরী।

মন্দিরা কাঁদল না একটুও। কাঁদল ওর মা। পরদিন রাত্তিরে মন্দিরার দাদুর ঘরে এসে ঢুকলেন ওর বাবা। দেখলেন ও বই পড়ছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি পড়ছিস মা?' মন্দিরা উত্তর দিল, 'তিতাস একটি নদীর নাম।' ওর বাবা বললেন 'যার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে সে যদি এসব ভালো না বাসে?'

মন্দিরা কোনও উত্তর দিল না। ওর বাবা বললেন 'আজ রাত্তিরে তুমি তোমার ঘরে শোবে। দোতলায়।'

'না।'

'না কেন?'

'দাদুর শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত আমি এই ঘরে থাকব। তারপর আমি নেমে যাবো দোতলায়। আমার ঘরে।'

'তোর ভয় করে না?'

'কিসের ভয়? আমার তো কোনও ভয় নেই।'

দাদুর মৃত্যুর পর আজ পঞ্চম দিন। বাবা মা বেরিয়েছেন মারুতি নিয়ে শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে। ভয় ছিল না মন্দিরার। দোতলায় একটা চাকর আর রান্নার বুড়িমা রয়েছে। দাদুর ঘরে বসে আছে মন্দিরা। অন্ধকার নেমে এসেছে সুইমিং পুলের জলে। জলের মধ্যে যেন কিসের একটা শব্দ হচ্ছে। শব্দটা জল থেকে উঠে আসছে শিউলি গাছের ফুল আর পাতার ভেতর দিয়ে। আজ বেশ কিছুদিন হলো শিউলি ফুটছে। পুজো আসছে নাকি? কদিন বাকি আর?

'কে?'

'আমি।'

কে একজন ঘরে এসে ঢুকল। এ লোকটাকে কি অনেক দিন আগে চিনত সে? লোকটা এখানে ঢুকে পড়ল কি করে? একতলা থেকে এই তিনতলায় উঠে এলো কি করে?

'কে আপনি?'

'আমাকে চিনতে পারছো না মন্দিরা?'

'না।'

'আমি দীপঙ্কর। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমেরিকায় আমার থিসিসের কতো প্রশংসা হয়েছে জানো? এদেশ থেকে পাঠানো থিসিস। বম্বেতে বসে কাজ। কিন্তু ওরা বলেছে এরকম কাজ বহুদিনের মধ্যে কেউ করেনি।'

'তুমি দীপঙ্কর? তুমি এত বুড়ো হয়ে গেছ? তোমার গাল ভেঙে গেছে। তোমার মাথার সব চুল পেকে গেছে।'

'না, ভুল দেখছো তুমি। আমাকে বউদি বলেছে আমি আরও সুন্দর হয়েছি।'

'না না না তোমার মাথার সব চুল পেকে গেছে। তুমি বুড়ো হয়ে গেছ।'

'ভুল মন্দিরা ভুল। সারাদিন দাদুকে দেখতে দেখতে সবাইকে তুমি এখন বৃদ্ধ দেখছ। তোমার মা আমাকে চিঠিতে সব লিখেছেন।'

'কিন্তু দাদু তো মরে গেছে।'

'দাদু মরে গেছে কিন্তু এই আয়নাটা তো মরে নি।...' আয়নার পাশে টেবিলের ওপরে রাখা রুপোর বিরাট ফুলদানিটা তুলে নিয়ে দীপঙ্কর আঘাত করে আয়নার ওপর। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে সাতফুট লম্বা আয়নাটা। 'একমাস ধ'রে এই আয়না দিয়েই তুমি সবকিছু দেখছ, মনে হচ্ছে সব বুড়ো হয়ে গেছে...এবারে দ্যাখো তো...।' দীপঙ্কর মন্দিরার সামনে এসে দাঁড়ায়।

রোদ আসে না

দিনদুপুরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত বৃষ্টির যেন আর বিরাম নেই। মাঝে মাঝে যখন থামছে তখনও মেঘে ঢেকে আছে দুপুর। দূরে একটা পুকুরের পাড়ে ধোপারা কাপড় মেলতে দেয়। গত কয়েকদিন সেখানে একটা কাপড়ও দেখা যায়নি। সর্বক্ষণই ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত। ভেসে আসছে জল ভেজা ফুলের গন্ধ। বহু যুগের ওপার হতে উড়ে এসে মন খারাপ ছেয়ে ফেলছে চারপাশটাকে।

'এত বড় একটা শহরে আর কোথাও তুমি বাড়ি পেলে না?'

'কেন হয়েছেটা কি, এ বাড়িটা খারাপ কিসে?'

'তোমার আর কি, সারাদিন বাইরে থাকো, বাড়িতে রোদ এলো কি এলো না তোমার তো কিছু যায় আসে না।'

'আবার সেই রোদ? রোদ আজ ওঠেনি, কাল উঠবে।'

'ছাই উঠবে। চারদিন হলো একটা কাপড়ও শুকোয়নি আমার।'

'তোমার কি শাড়ির অভাব হয়েছে?'

'শাড়ির কথা কে বলছে? আর বললেই বা কি? ঘরের মধ্যে কি তসর পরে ঘুরে বেড়াবো? সারাদিন অন্ধকার হয়ে থাকে। এই একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ আমার আর ভালো লাগছে না। বাড়িটায় এক ফোঁটা রোদ ঢোকে না।'

'আচ্ছা মণি, তুমি বলতে পারো কলকাতা শহরে রোদ সবচেয়ে বেশি ওঠে কোথায়?'

'জানি না।'

'টাটা সেন্টারের ছাদে। গিয়ে দ্যাখো ওখানেও এখন ঝরঝর বরিষে বারিধারা। আমি তো ভেবেছিলাম এরকম একটা পরিবেশ তোমার ভালো লেগে যাবে। কলকাতার মধ্যে আছি অথচ সব কোলাহলের বাইরে একটা মফস্বল গন্ধ। এটাকে তুমি খারাপ বলছো?'

বিয়ের পর সুমন্ত হায়দারাবাদে ছিল পাঁচ বছর। ওখান থেকে কোম্পানি ওকে জামশেদপুরে নিয়ে এলো এক বছরের জন্যে। ওরা একটা ব্রিজ বানাচ্ছিল। সুমন্তকে ছেড়ে মণি থাকতে পারে না। কলকাতায় সুমন্তর মা-র সঙ্গে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেও সঙ্গে এলো। কিন্তু একবছর থাকা হলো না। দুর্গাপূজার ভাসানের সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বেধে গেল। একদিন বিকেলের দিকে সুমন্তর মিস্তিরিদের ওপর তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিছু হিংস্র লোক। বাধা দিতে গিয়ে সুমন্ত নিজেই আঘাত পেল, রক্তাক্ত হাতে জিপ চালিয়ে বাড়ি ফিরে এলো, মণিকে বলল, 'ওরা ছাড়বে না, রাত্তিরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, এক্ষুনি চলো।' জিপ নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। ঘাটশিলায় কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে, পরদিন অসংখ্য কাকের ডাক পেছনে রেখে ওরা চলল কলকাতার উদ্দেশে।

কোম্পানি ওকে জামশেদপুর পাঠাতে আর সাহস পেল না।

মণিদীপার বাবা মা ছেলের ফুলবাগানের বাড়ি ছেড়ে চলে এলো। বাড়ি খুঁজতে বেরোতে

হলো সুমন্তকেই। চেতলা অহীন্দ্র মঞ্চের কাছে একটা বাড়ি পাওয়া গেল। মাস ছয়েক সেখানে থাকার পর সুমন্ত বুঝল আর সম্ভব নয়।

'কেন, কি অসুবিধে হচ্ছে তোমার?'

'অসুবিধে ঘরজামাই হয়ে থাকার।'

'মেয়েরা যদি শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে থাকতে পারে ছেলেরা কেন পারবে না?'

'এ কথা তোমার মুখে মানায় না।'

'কেন?'

'কারণটা কি খুলে বলতে হবে?'

'তোমার মা'র সঙ্গে কেউ থাকতে পারে না।'

'তোমার বউদিও এই একই কথা বলেছে।'

কোম্পানি ওকে ফ্ল্যাট নিতে বলেছিল। নেয়নি সুমন্ত। ফ্ল্যাট নিলে ভাড়াটা কোম্পানির কাছ থেকে সরাসরি যাবে বাড়ির মালিকেব কাছে। বাড়ি ভাড়া বাবদ যে বাইশ শ টাকা ওর পাবার কথা সেটা ওর নিজের হাতে আসবে না।

অতএব কোম্পানিব ঠিক করা বাড়ি ও নিতে পারে না। ওর দরকার টাকাটা নিজের হাতে পাবার। সুমন্ত যেহেতু অফিসের গাড়ি পায় তাই সে মূল শহর থেকে একটু বিচ্ছিন্ন জায়গায় বাড়ি খুঁজতে গিয়ে এটা পেয়েছে। হাজার বারো শ টাকার মধ্যে কোনও ভালো জায়গায় বাড়ি পাওয়া একেবারে অসম্ভব। কোম্পানির ওই গাড়িটা থাকার ফলেই শহরের যে কোনও প্রান্তে সে বাড়ি নিতে পারে। নশো টাকায় বেহালার ব্রাহ্ম সমাজ রোডে একটা বাড়ি পেয়েছিল। ছোট্ট দু খানা ঘর। ঘর ছোট বলে সমস্যা হয়নি। হয়েছে বাড়িতে রোদ ঢোকে না বলে। বাড়ির সামনে একটা কারখানা রোদ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্রাহ্ম সমাজ রোডের বাড়ি থেকে হিন্দু ব্রাহ্ম শিখ খ্রিষ্টান যে কোনও রোডে একটা বাড়ি পেলেই সে চলে যায়।

পেল বেলতলা রোডে। ভালো পাড়া। এখানেও একই সমস্যা। রোদ ঢোকে না বাড়িতে। সামনে বস্তি। সারাদিন ঘরে আলো জ্বেলে কাজ করতে হয়। ছেড়ে দিতে হলো বেলতলা রোডের বাড়ি। অনেক দূরে সরে এলো সুমন্ত।

সেদিন রবিবার।

বিকেলের দিকে মণিদীপার দাদাবউদি এলো নতুন বাড়ি দেখতে। সঙ্গে তাদের ছেলে ডঙ্ক। ছেলেরা ফুটবল নিয়ে চলেছিল মাঠের দিকে। ডঙ্ক সেখানে খেলা দেখতে যাবে। সুমন্তই ওকে নিয়ে গেল। আধ ঘণ্টা পরে ওরা ফিরে এলো দুজনে। পিসিমণির সঙ্গে ওর খুব ভাব। হাতে পায়ে সারা গায়ে কাদা মেখে ছেলেরা ফুটবল খেলছিল জল জমে থাকা ঘাসের মধ্যে। 'লা মার্টিন'-এ পড়া ছেলেটা জানতো না ফুটবল খেলায় এত আনন্দ আছে। ডঙ্ক তার মাকে বলে, 'এর পর যেদিন আসবো সেদিন কিন্তু আমি থাকবো এখানে।' মণি ওদের খাবার সাজিয়ে দিল।

'ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছো না তুমি?' পুষ্পাংশু জিজ্ঞেস করল সুমন্তকে।

সুমন্ত মণিদীপার দিকে তাকাল।

'আমার দিকে তাকাচ্ছো কেন?' বোনের প্রশ্ন শুনে পুষ্পাংশু বলল, 'নিজের বউয়ের দিকে তাকাচ্ছে এতে দোষ কি, এখন তো পরস্ত্রীও লিগাল।'

এমন উজ্জ্বল হাসিখুশি একটা মানুষ, মা বাবাকে রাখতে গিয়ে কেতকীর সঙ্গে বহু ঝগড়া

হয়েছে তার। শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হয়েছে পুষ্পাংশুকে। সুমন্তকেও হেরে যেতে হবে।

ভাগ্যিস বাবা মা থাকে না তার সঙ্গে। জগতে কেউ কি শান্তিতে আছি? এক মুহূর্তের জন্য অনমনস্ক সুমন্ত।

'আসলে মণি যেতে চাইছে না, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি একাই চলে যাও।'

'বাঃ দাদা, তুমি ওকে চলে যেতে বলছ, আমি থাকবো কোথায়?

'তুই মার কাছে গিয়ে থাকবি।'

ওরা দশ বছরের ছোট বড়। দাদার মুখের ওপর মণি তাই কোনও কথা বলতে পারে না। খোঁচাটা তাকে হজম করতেই হয়। কিন্তু একেবারে ছেড়েও দেয় না সে, 'বুড়ো একদিন আমরাও হবো দাদা। আমাদেরই বা কে দেখবে তখন?' এবার দাদাকে চুপ করে থাকতে হয়। কথাটা কেতকীর গায়ে লাগে। সে টের পায় কথাটা তাকেও শোনানো হয়েছে। অতএব কেতকী সেই অপ্রিয় কথাটাই জিজ্ঞেস করে বসে, 'মণি, এ বাড়িতে রোদ পাচ্ছো তো?'

'রোদ? আজ সতের দিন হলো এ বাড়িতে এসেছি। একটা দিনের জন্যও রোদ ওঠেনি। সামনের এই বাড়ি দুটোর জন্যে রোদ এখানে কোনওদিনই ঢুকবে না। আমি ওকে তখনই বলেছিলাম একতলা হলে নিও না বাড়িটা।'

'সুমন্তকে তাহলে কি আবাব বাড়ি খুঁজতে হবে?'

সুমন্ত উত্তর দেয়, 'না, আর নয়, এখানে থাকতে হলে থাকবে, নাহলে আমি ব্যাঙ্গালোর চলে যাবো।'

মণির গলা শোনা যায়, 'জুলুম নাকি?'

কথা বলে ওর দাদা, 'জুলুমের কি আছে? তুই এই রোদের বায়নাটা ছাড় তো এবার।'

'বায়না কেন? বেহালার বাড়িটা তো কারখানার ধোঁয়ায় একেবারে কালো হয়ে ছিল।'

'কারখানার ধোঁয়া তো ওপরে উঠে যায়, তোর বাড়ি কালো হলো কি করে?'

'কেন দ্যাখোনি তুমি? বউদিও তো বলেছিল তখন, বাড়িটা অস্বাস্থ্যকর, বাড়িটা তোমরা ছেড়ে দাও।'

সুমন্ত বলে, 'এতদিন ওয়েদার এত খারাপ রোদ উঠলটা কোথায়? বর্ষাকালে বৃষ্টি তো হবেই কিন্তু এরকম একটানা বৃষ্টি কলকাতায় কেউ দেখেছে কখনও?'

পুষ্পাংশু ওদের কয়েকদিন দার্জিলিঙ ঘুরে আসতে বলে।

দার্জিলিঙ-এর বিখ্যাত স্কুলে পড়ছে ওদের একমাত্র ছেলে কৃপালু। এত খুনজখম, হানাহানি, এত সন্ত্রাসের মধ্যেও স্কুল বন্ধ হয়ে যায়নি। হস্টেলে ছেলেরা যেমন ছিল তেমনই আছে। অন্য সব নামী দামি স্কুল থেকে কিছু ছাত্রছাত্রী শিলং কলকাতা কিংবা চলে গেছে দিল্লি দেরাদুন। কৃপালুদের স্কুল থেকে অভিভাবকরা ছেলেদের সরিয়ে আনেনি। ওই স্কুলে ভর্তি করার জন্য বোম্বাই কিংবা মাদ্রাজ নয়, সমস্ত দেশ থেকে সারা বছরই লোকে চেষ্টা করে যায়। কালিঝোরার বাংলো থেকে ইয়ুথ হস্টেল থেকে টাইগার হিলের টুরিস্ট লজ পর্যন্ত কতো কি ওরা পুড়িয়ে দিল, লেবং-এর রাস্তা ভেঙে ফেলল, সেতু উড়িয়ে দিল, ওই স্কুলে কোনও ভাঙচুর করতে পারেনি। সুমন্ত এই যে তার বাড়িভাড়া থেকে হাজার বারোশ টাকা বাঁচাবার চেষ্টা করে সে তো ওই ছেলেরই জন্যে।

উইনটার ভেকেশনের সময় ছেলেকে ওরা নিয়ে আসে, আড়াই মাস ছুটির পর আবার নিয়ে যায় মার্চ মাসের দু তারিখে। কনকনে মার্চ উইন্ড-এ শীত যদিও তখন আগের দুটো মাসের মতো একইরকম। স্কুলের ভেতরটায় ঢুকলে বোঝা যায় এখানে রেখে পড়ানো আর বিলেতে পড়ানো একই ব্যাপার।

সকালে আলো জ্বালিয়ে কাজ করছিল মণি। কিচেনটা একেবারে অন্ধকার। কিচেনের ওদিকে কি এত ঝোপঝাড় ছিল? বাড়িওয়ালা কার্তিক সিনহা বলেছিল পেছনে কিছু গাছপালা আছে। এখন তো দেখা যাচ্ছে রীতিমতো জঙ্গল। নাকি কয়েকদিন বৃষ্টিতে গাছপালা সব তরতর করে বেড়ে উঠেছে? সাপখোপও আছে নিশ্চয়ই।

দেখে খারাপ লাগল সুমন্তর। সত্যিই রোদ আসে না বাড়িটায়। নতুন বাড়ি। দুখানা বড় ঘর। ডাইনিং হল। ড্রয়িং রুম। সবই ছিল। রোদের বাতিক আছে মণিদীপার। এটা জেনেও বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি সে, বাড়িতে রোদ ঢোকে কি না। একথা জিজ্ঞেস করা যায় না কাউকে। কম হোক বেশি হোক রোদ তো আসবেই। দিনটা তো দিনই।

'তুমি ঠিকই বলেছ মণি, সত্যিই বাড়িটায় রোদ ঢোকে না।'

'আর আমার বউদি সে নিয়ে ব্যঙ্গ করে গেল।'

'ব্যঙ্গ করবে কেন।'

'তোমার তো ওকে ভালো লাগবেই। তোমাকে বলে হিরের টুকরো ছেলে, অনেক ভাগ্য করে এরকম স্বামী পাওয়া যায়। কেন, তোর স্বামীটা খারাপ কিসে? এরকম ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে তুই কোনওদিন ভাবতে পেরেছিলি? তোর বোনেদের কি বিয়ে হয়েছে দেখিনি আমরা? আমার দাদার সঙ্গে কারও তুলনা হয়? আসলে বউদি তোমার এত প্রশংসা কেন করে জানো, করে ও আমাকে সহ্য করতে পারে না বলে।'

'তার মানে?'

সুমন্ত জানে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সে অফিসের জন্য তৈরি হয়।

দুপুরে এলো মণিদীপার মা আর বাবা। সারা বাড়িটায় তখন গা ছমছমে ঠাণ্ডা। মণিদীপা মাকে জানাল বাড়িটা দেখার সময় সুমন্ত ওকে নিয়ে আসেনি। এলে এ বাড়ি ও কিছুতেই পছন্দ করত না। মেনকা তার স্বামীকে বলল, 'সারা বছর তো সর্দিকাশিতে ভুগছে, এই তো সেদিন এক্সরে করে এতগুলো টাকা খরচ হলো, এ বাড়িতে থাকলে মেয়ের শরীর কোনওদিনই ভালো হবে না। একটা কঠিন অসুখ বাধিয়ে বসলে তখন আর কোনওদিকে কূল করতে পারবে না। জামাইকে তুমি বুঝিযে বলো, তোমার কথা ও শুনবে।' জ্যোতির্ময় স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেয়, তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা ভালো বাড়ি খুঁজে পাওয়া প্রায় একটা লটারির টিকিট পাওয়ার সমান। লটারির টিকিটের জন্য কষ্ট করতে হয় না, বাড়ি পাওয়ার জন্যে করতে হয়। ওর ভালোমন্দ ওই সবচেয়ে ভালো জানে। ওকে উপদেশ দেওয়া তার সাজে না। সে বিদ্যে তার নেই। একটা ইঞ্জিনিয়ার ছেলে, এত কিছুতে সে মাথা খাটাচ্ছে আর নিজের বাড়ি কোথায় নেবে সে জানে না? ছেলের সংসার থেকে চলে আসতে হয়েছে, এর পর জামাইও কোনও সম্পর্ক রাখবে না। নিজের ছেলের ওপরই যার অধিকার নেই সে কি করে জামাইকে পরামর্শ দিতে যায়? তাছাড়া এটা অন্যায়। বৃষ্টি থেমে গেলে এ বাড়ির চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে। শুধু রোদ রোদ করে মাথা খারাপ করলেই হবে নাকি? বেহালার বাড়ির সামনে কারখানা ছিল। বেলতলার বাড়ির চারপাশটাও হয়তো ভালো ছিল না। আশপাশের বস্তিগুলো জায়গাটা নোংরা

করে রাখতো। কিন্তু এ পরিবেশটা তো ভারী সুন্দর। রোদ আসে না এটা ওর মনের রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'মনের রোগ কিনা টিবি হয়ে মরব যখন, তখন বুঝবে।'

'তুই বড় অবুঝ হয়ে যাচ্ছিস মা।'

মেনকা মেয়ের পাশে এসে বসে। মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, আমিই বলব ওকে।' জ্যোতির্ময় নির্দেশের ভঙ্গিতে জানায়, 'না, তুমি বলবে না। তুমি যেখানে আছো সেটা তোমার ছেলে জোগাড় করে দেয়নি, দিয়েছে তোমার জামাই। এতে নিজেদের মান থাকে না।' মেনকা বলে, 'তাহলে তুই কদিন আমার কাছে গিয়ে থাকবি চল।'

জ্যোতির্ময় জানতে চায়, 'সুমন্ত খাবে কোথায়?' কেউ কোনও কথা বলে না।

বড় স্নিগ্ধ চারপাশ।

গহন মেঘের মায়াজড়ানো পথ। বিস্মরণের তলে গাছগাছালি। আকাশভরা বেদনা গোপনে নেমে যায় দূরের পুকুরে। রোদ আসে না।

নিস্তব্ধ দিগন্তে মিলিয়ে যায় সাইকেল রিকশার হর্ন। রোদ ওঠে না।

বাড়িওয়ালা কার্তিকবাবু কোনও অ্যাডভান্স নেয়নি। ওদের কোম্পানিতে মাল সাপ্লাই করে। সুমন্তকে ভয় করে। জানে কোনও ঝামেলা করলে সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে। সুমন্তর সই-এর ওপর ওকে নির্ভর করতে হয়। বাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার অসুবিধে কিছু নেই। কিন্তু এতে কি একটা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে না? আবার একটা বাড়ি পাবেটা কোথায় যেখানে সবরকম সুবিধে পাওয়া যাবে, যেখানে সারাদিন রোদ ঝলমল করে?

মনের ওপর চেপে বসে মেঘলা দুপুর আর বৃষ্টির শব্দ। একা থাকলে আরও। যতোটা বলছে মণি ততোটা নিশ্চয়ই নয়। সত্যিই কি রোদ ঢোকে না বলে বাড়িটা পছন্দ হচ্ছে না মণির? নাকি অন্য কিছু? আর কি কারণ থাকতে পারে? মণিদীপা এরকম গুম হয়ে বসে থাকে কেন? কিছুই ভালো লাগে না তার?

সারাদিন এই বিমর্ষ বাড়িটার মধ্যে একা বসে থেকে থেকে নিজের মনটাকে ও আরও ভারী করে তুলছে। এইসব বাড়ি বড় বিচ্ছিন্ন করে দেয় মানুষকে।

তাহলে কি এ বাড়িটাও ছাড়ার কথাই ও ভাবছে? সেটাই ওর মাথায় ঘুরছে? এবার বাড়ি দেখতে গেলে মণিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। মণির পছন্দ হলে তবেই বাড়ি নেওয়া হবে। কিন্তু এ শহরে তেমন একটা বাড়ি কি কোথাও আছে যা মণিদীপার সব ইচ্ছা পূর্ণ করে দেবে? হয়তো আছে।

রূপক রায়গুপ্ত সুমন্তর সামনে এসে দাঁড়ায়। সুমন্ত বলে 'বসুন।'

'স্যার একটা কথা ছিল।'

'কি কথা?'

'সল্টলেকে দীপেন মজুমদারের নতুন বাড়িটা ভাড়া দেবে। তিন হাজার টাকার বেশি পাবে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনি নিলে আপনি যা দেবেন তাতেই উনি রাজি।'

'তা কি করে হয়?'

'কেন হবে না? আপনি যে ওকে সাহায্য করেছিলেন সেটা উনি ভুলে যাননি। শ্রীরামপুরের কাজটা পাবার জন্যে উনিও তো চেষ্টা করছেন।'

'আমরাও করছি।'

'শেষ পর্যন্ত আমরা হয়তো ছেড়েই দেবো। সেরকমই শুনেছি। কারণ ওখানেও কোম্পানি আপনার ওপরই নির্ভর করছে। এদিকে কালিম্পং-এ ঝামেলা বাড়ছে, হয়তো আপনাকেই যেতে হবে। আমরা কাজটা না নিলে মজুমদার এন্ড সন্স ওটা পেতে পারে।'

সুমন্ত টেবিলের ওপর রাখা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে।

'কবে দেবে বাড়িটা?'

'আপনি বললে কালই।'

'যদি বাড়ি নেবার পর কাজটা ওরা না পায়? যদি অন্য কোথাও আটকে যায়?'

'যাবে। আপনাকে বাড়ি ভাড়া দিলে ও ধন্য হবে যাবে।'

আরও কম টাকায়ও দীপেন মজুমদার রাজি হয়ে যেত। সুমন্ত দেখল ভাড়া থেকে টাকা বেশি বাঁচিয়ে আর লাভ নেই। সে দেড় হাজার টাকা দেবে বলে জানিয়ে দিল। এবার মণিও সঙ্গে এলো বাড়ি দেখতে। তিন হাজারী বাড়ি।

আবার কোম্পানির কাছে ট্রাক চাইতে হয়। ট্রাক এসেও যায়। সব মালপত্র চলে আসে। শুধু ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আয়নাটা ওর অফিস কিনেছিল কাশিমবাজারের রাজার বাড়ি থেকে।

নতুন বাড়িতে দোতলার লম্বা বারান্দায় একা হাঁটছিল মণিদীপা। দেখল সুমন্ত গাড়ি থেকে নামছে। এসময় তো আসে না কখনও। তখন বিকেল চারটে। নীচে দাঁড়িয়ে সুমন্ত দেখছে বিকেলের রোদ এত ভালবেসে এর আগে আর কোনও মেয়ের গায়ে লাগেনি।

'কি ব্যাপার চলে এলে?'

'দার্জিলিঙ যাবো।'

'সে কি, কবে?'

'আজই।'

'কেন?'

'অফিসে ট্রাঙ্ককল এসেছে। কাল সকালেই যেতে বলেছে। দেখলাম তোমার মা যখন রয়েছেন চলেই যাই। না থাকলেও অবশ্য যেতেই হতো।'

'কেন, এত কি জরুরি?'

'কালিম্পং-এ আমাদের একটা ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। লোকাল লোক অনেক নেওয়া হয়েছে। তবু ওরা ঝামেলা করছে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে আজ সাত আটদিন হলো কাজ বন্ধ।' 'তুমি গিয়ে কী করবে?'

'কোথাও কোনও গোলমাল হলে কোম্পানি তো আমাকেই পাঠায়।'

সকাল নটা পাঁচে দার্জিলিঙ মেল এসে পৌঁছল নিউজলপাইগুড়ি। শিলিগুড়ি অফিস থেকে একটা অ্যামবাসাডার এসে দাঁড়িয়েছিল স্টেশনে। ড্রাইভার সাহেবকে সেলাম করল। কোম্পানির পুরোনো নেপালি ড্রাইভার মোতিবীর রাই। সে জিজ্ঞেস করল, সাহেব কেমন আছেন? সুমন্ত উত্তর দিল, 'ভালো।' মোতি জানতে চাইল সাহেব এখন কোনদিকে যাবেন।

সুমন্ত বলল 'আগে দার্জিলিঙ যাবো। ছেলের সঙ্গে একবার দেখা করে দুপুরে লাঞ্চ সেরেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। ফেরার পথে কখন কোথায় যাবো তো জানি না।'

'ওকে স্যর' বলে মোতি গাড়িতে স্টার্ট দিল। বর্ষাকালে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ ওঠার

মতো এমন রাস্তা আর কোথায়? পাগলা ঝোরা থেকে শুরু করে অসংখ্য ঝোরার শব্দের মধ্যে পথটা চলে যাচ্ছে যেন জগতের বাইরে।

সুমন্তর গাড়ি এসে ঢুকল কৃপালুদের স্কুলে।

অনেকটা রাস্তা জুড়ে দুধারে পাইন আর রডোডেনড্রনের সারি। নতুন জাপানি মনাস্টেরি থেকে ড্রামের শব্দ ভেসে আসছে। হাতে সময় বড় কম। সুমন্ত এসে সোজা ঢুকে যায় ফাদার ডেভিডের ঘরে।

ফাদার ওকে দেখে চমকে ওঠেন, 'আপনি?'

সুমন্ত বলে, 'কালিম্পং যাবো। ফেরার পথে কখন সময় হবে তা জানি না, তাই এখন একবার কৃপালুকে দেখে চলে যাই, এই ভেবে ঢুকে পড়লাম।'

ফাদার বললেন, 'ভালোই করেছেন। আমি একঘণ্টা আগে আপনার কলকাতার অফিসে কথা বলছিলাম। ওরা বলল, আপনার শিলিগুড়ি অফিসে ফোন করতে। ওখানেও করেছি।'

'কেন, কৃপালুর কিছু হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ, সোমবার থেকে কৃপালু চোখে কিছু দেখছে না।'

'তার মানে?'

ফাদার বলতে থাকেন, 'পরশুদিন সোমবার সকাল নটার সময় অঙ্কের টীচারকে ও বলে ব্ল্যাকবোর্ডে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। হাত ধরে ওকে রুমে নিয়ে আসতে হয়। গতকাল ইংলন্ড থেকে দুজন ডাক্তার এসেছে এখানে। উঠেছে আমাদেরই গেস্ট হাউসে। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে পৃথিবী বিখ্যাত চোখের ডাক্তার। তাকে কালই দেখিয়েছি। ডাক্তার বলেছেন দুমাস পর অপারেশন করতে হবে।'

সুমন্ত জিজ্ঞেস করে, 'কৃপা আছে কোথায়?' ফাদার বলেন, 'ওর ঘরেই আছে। দরজা জানালা সব বন্ধ করে রাখা হয়েছে।'

'কেন?'

পুরুষ মানুষের গলায় এত মমতা আছে জানতো না সুমন্ত, 'ডাক্তার বলেছে দুমাস পর অপারেশন করতে হবে। এই ষাট দিন ওকে এমন একটা ঘরে রাখতে হবে যেখানে এক ফোঁটা রোদ ঢোকে না। রোদ, শুধু রোদের কাছ থেকে ওকে সরিয়ে রাখতে হবে। এক বিন্দু সূর্যের আলো ওর চোখে লাগতে পারবে না। এখন লাল কাপড় দিয়ে চোখ দুটো ঢাকা আছে। কাল পরশু আপনি ওকে কলকাতায় নিয়ে যান। ডাক্তারের সঙ্গে তিনটের সময় আপনার কথা হবে। ঈশ্বর ওর ভালো করুন।'

কাচের জানালায় নেটের গোলাপি পর্দা থেকে মানচিত্রের নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে রোদ লুটিয়ে পড়ছে তখন প্রভু যিশুর পায়ে।

বোধিদ্রুম

মাসকাট থেকে আনা টি-ব্যাগে ভেজানো চায়ের কাপটা প্লেটের ওপর থরথর করে কাঁপছিল সুকান্তর হাতে। এ দেশের সবচেয়ে দামি চা এদেশে তো থাকে না, চলে যায় অন্য দেশে। সেই সোনার দামের চায়ের গন্ধে গোটা ঘর যখন ভরে গেছে তখন সেই গন্ধ একফোঁটাও লাগছে না সুকান্তর নাকে। চোখের কালো মণিদুটোও কি লাল হয়ে গেছে? ত্রিপুরার বেতের বিশাল টেবিলের চারপাশ ঘিরে ছখানা বেতের চেয়ার, যা কেবল রাজভবনেই মানায়, সেখানে বসে আছে ওরা চারজন, সুকান্ত, ঊর্মিলা, চন্দ্রনাথ ও দীপ্তিকণা। সকলেই এ ওর দিকে চেয়ে দেখছে, সুকান্তর দৃষ্টি শুধু দেয়ালের রাজপুত চিত্রকলার রঙে খুঁজছে অন্য কোনও রং। টেবিলের ওপর নানা আকারের ডিশে সাজানো রয়েছে খাবার। সুকান্ত এক কাপ চা এক চুমুকেই শেষ করে দেয়।

'আমি যাচ্ছি তা হলে।'

'যাচ্ছি মানে? খাবে না কিছু? মা তোমার জন্যে নিজের হাতে এসব বানিয়েছে।'

'না খাবো না।'

'কেন?'

'সন্ধের পর আমি কিছু খেতে পারি না।'

এবার কথা বলেন চন্দ্রনাথ, 'যেতে পারবে তুমি, এ অবস্থায় বাসে ট্রামে ওঠো কি করে? তোমার একবারও মনে হয় না যে মরে গেলে তো গেলেই, কিন্তু সারা জীবনের জন্যে যদি পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকো?'

আবার চেয়ারে বসে পড়ে সুকান্ত। বসতে গিয়ে টেবিলের এক কোণে রাখা নটরাজ, বেতের নটরাজ সুকান্তর হাত লেগে ছিটকে চলে যায় দরজার গোড়ায়। অপ্রস্তুত হতে হয় না ঊর্মিলাকে। ওর বাবা মা দুজনেই জানে সুকান্তর কথা। ডাক্তার সুকান্ত চক্রবর্তীকে ভালোবাসে তাদের মেয়ে। সন্ধের পর থেকে যে এক এক দিন এক এক রকমের নেশা করে, করে আজ নয়, অনেকদিন থেকে। প্রথম প্রথম বাবা মা দুজনেই মেয়েকে বাধা দিয়েছিল, বাধা বলতে অন্য কিছু নয়, তারা ওকে বুঝিয়েছিল ভালোবাসা দিয়ে, প্রেম দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, এরকম নেশাগ্রস্ত যুবকের নেশা ছড়ানো যায় না, ওসব গল্প উপন্যাসে মানায়, বাস্তব বড় কঠিন, কঠোর রুক্ষ, নির্মম ও উদাসীন।

'তুমি এত নামকরা একজন লোকের ছেলে, তোমার বাবা মন্ত্রী হলেন না কারণ তিনি মন্ত্রী বানান, খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রোজ তাঁর খবর বেরোচ্ছে, ছবি ছাপা হচ্ছে, এত বড় একটা পার্টি তোমার বাবার ওপর কতখানি নির্ভর করে আছে, তোমার বাবাকে চটাতে যেখানে সরকার ভয় পাচ্ছে, সেখানে তারই ছেলে হয়ে তুমি এরকম নেশা করে নিজের সর্বনাশ করছ?' সুকান্তর গলা সহজে জড়ায় না, 'হ্যাঁ, আমার বাবা গিরিশ চক্রবর্তীর এক ডাকে জড়ো হয়ে যায় ষণ্ডা গুণ্ডা মাস্তানরা। ময়দানের মিটিং-এ লরি ট্রাক জোগাড় করা থেকে লাখো লাখো

লোক জড়ো করার দায়িত্ব আমার বাবার। পার্টির ইমেজ নষ্ট হবার মতো অনেক কিছুই করেছে গিরিশ চক্রবর্তী, পার্টির গোপন মিটিং-এ তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ খুব গম্ভীরভাবে আলোচনা করা হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ধামাচাপা দিতে পার্টি বাধ্য হয়।' সুকান্তর কি নেশা কেটে যাচ্ছে? এই সুযোগে দীপ্তিকণা একটা ডিশ তার মুখের সামনে তুলে ধরে। সুকান্ত মাথা নাড়িয়ে জানায় সে নেবে না। 'একটা অন্তত নাও' উর্মিলার মার অনুরোধ সে রক্ষা করতে পারে না। যে জিনিসটা আজ খেয়ে এসেছে সেটায় এতক্ষণে জগতের সব খাদ্যদ্রব্য থেকে তার মুখ ফিরিয়ে থাকারই কথা, খাদ্যে কোনও স্বাদ নেই, কি যেন নাম, অদ্ভুত প্রিয় একটা মশলার গন্ধ পাচ্ছে যেন। ডিশ থেকে একটা তুলে নিতেও ইচ্ছে করছে কিন্তু বুঝতে পারছে যে, ওই রুপোর চামচটা দিয়ে ওটা তুলতে হবে, পারবে না, হাতের আঙুলগুলো এখন তার নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। উর্মিলা এ ঘরে একা থাকলে সে হয়তো ওর মুখে জোর করে পুরে দিত এবং সেটাও অবশ্য সে পছন্দ করত না। উর্মিলার বাবা তাকে পঙ্গু হয়ে যাবার ভয় দেখাচ্ছে। লোকটার কি ধারণা তার মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে ও এ বাড়িতে আসে, না, কক্ষনো না। সে নিজে উর্মিলাকে ভালোবাসে না, কারণ সে কাউকে কখনও ভালোবাসে না। ও বস্তুটা কি সে জানে না, তবু সে আসে তার কারণ উর্মিলা তাকে দেখতে চায়, চরম নেশাগ্রস্ত অবস্থায়ও এসে দেখেছে উর্মিলার চোখ স্বাভাবিক, উর্মিলার ব্যবহার শান্ত, উর্মিলার কণ্ঠে জলের মতো স্বচ্ছতা। কি করে বোঝে সে? বোঝে। যখন তার সমস্ত শরীরটা অবশ হয়ে যায়, উর্মিলা যেন তাকে বশ করতে থাকে। তাই সে নেশা করে উর্মিলাকে পরীক্ষা করার জন্যে আসে না, তার ভালোবাসার রূপটা দেখার জন্য আসে না। আসে এক একটা দিন তার কোথাও যাবার থাকে না, ময়দানে একটা গাছও যেন খুঁজে পায় না, তার সামনে একটা টেবিল নেই, বেঞ্চ নেই, গাড়িবারান্দা নেই, পার্ক নেই, ইস্টিশন নেই, কিছু নেই, তখন কেন যেন মনে পড়ে উর্মিলা আছে, তাই আসে। সুকান্ত আবার কথা বলতে আরম্ভ করে, 'মিনিবাস হোক, থিয়েটার হল হোক আর হকার্স কর্ণার হোক, যেখানেই আগুন লাগুক না কেন, সবাই আমার বাবার কাছে ছুটে আসে। বেলেঘাটা বস্তিতে গরিব শ্রমিকরা আক্রান্ত হলে আমার বাবা তাদের সাহস যুগিয়ে আসে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্যে টাকা তুলতে হবে, বাবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে কতো টাকা তুলল তার কোনও হিসেব নেই, বম্বে থেকে ফিল্মস্টাররা সব গিরিশ চক্রবর্তীর ডাকেই তো উড়ে এলো। দাঙ্গাবিরোধী শান্তি মিছিলে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা সব বাবার ডাকেই তো নীরবে হেঁটে গেল। অবাঙালি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যেমন ওঁর ভালো সম্পর্ক বাঙালিদের সঙ্গেও সেরকমই। পার্টিতে এত চাঁদা আর কেউ তুলে দেয় না। কোথাও কোনও হাঙ্গামা থামাতে বাবার বেশিক্ষণ লাগে না, আরও অনেক কম সময় লাগে হাঙ্গামা বাঁধাতে। আমার ঠাকুম্মার শ্রাদ্ধে দশ হাজার টাকার ফুল পাঠিয়েছিল এক নামকরা প্রোমোটার।'

সুকান্ত উঠে দাঁড়ায়। উর্মিলা তার পেছন পেছন আসে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে যায় সুকান্ত। উর্মিলা দেখছে ট্রাম লাইনের ওপর দিয়ে টলতে টলতে চলেছে সুকান্ত, পেছনে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে, সুকান্ত কি শুনতে পাচ্ছে না, সুকান্ত লাইন থেকে সরে যাচ্ছে না কেন?

'উর্মি।'

বাবার ডাকে উর্মিলা ঘরে এসে ঢোকে।

'সুকান্ত ট্যাবলেট খায়।'

'হ্যাঁ, শুধু ট্যাবলেট না, ওটা খেয়ে মদ খায়, পেলে হেরোইন খায়।'

'টাকা নিশ্চয়ই ওর বাবার কাছে থেকে নেয় না।'

'না।'

'তাহলে পায় কোথায়?'

'টিউশানি করে।'

'তারা জানতে পারলে তো টিউশানি থাকবে না।'

'ও দিনের বেলা পড়ায়। দিনের বেলা নেশা করে না। কিন্তু সন্ধে হলেই ও এরকম হয়ে যায়।'

'একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'তুমি আজ থেকে ওর সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না।'

'কেন?'

'তাতে তোমার জীবনটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'বাবা, এরকম কথা তো তুমি আগে কখনও বলোনি আমাকে।'

'কিসের হতাশা ওর?'

'সেকথা আমিও ওকে জিজ্ঞেস করেছি। ও বলে, আমার কোনও হতাশা নেই, নেশা করতে আমার ভালো লাগে তাই করি। আমি বলেছি, তাই বলে ড্রাগ, হেরোইন? তুমি ঘরে বসে যত খুশি মদ খাও, কে তোমাকে বারণ করেছে। কিন্তু যে নেশা একটা গোটা দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তুমি সেই নেশা করবে? তুমি এই সমাজের শত্রু। তোমাকে দেখলে যে কোনও বাবা-মা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। এসব কথা প্রথম প্রথম আমি অনেক বলেছি। ও কোনওদিনই বলেনি কাল থেকে এই নেশা আমি ছেড়ে দেব, কোনওদিন কোনও প্রতিজ্ঞা করেনি।'

'তাহলে?'

'তাহলে কি?'

'কেন তুমি ওকে এখনও বন্ধুর মতো বাড়িতে ডাকো?'

'এখন আর ডাকি না। যেদিন আসে নিজেই আসে। এসে বলে এই শহরে কোথাও একটা গাছ নেই যার নীচে একটু বসা যায়, ট্রামলাইনগুলো সব এঁকেবেঁকে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, কান ফাটিয়ে দেবার মতো ঘন্টি বাজছিল, কিছুক্ষণ বসে আমি চলে যাবো।'

'গিরিশ চক্রবর্তীর সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই?'

'দুজনের দেখাই তো হয় না, সম্পর্ক থাকবে কোত্থেকে?'

'ওর বাবা যদি ওকে কোনও মেন্টাল হোম-টোম-এ রেখে কিছু চেষ্টা করতো।'

'তুমি করো না বাবা।'

'আমি?'

বাঁশবেড়িয়ার কাছাকাছি একটা গ্রামের নাম কনকপুর। চন্দ্রনাথ মুখার্জী সেখানে একটা বিরাট জমি কিনে গড়ে তুলেছেন একটি অনাথ আশ্রম। চন্দ্রনাথের খুব কম বয়েসে তার বাবা বোধিসত্ত্ব মুখার্জীর মৃত্যু হয়। তিনি রেখে গিয়েছিলেন অগাধ সম্পত্তি পৈত্রিক সূত্রে। চন্দ্রনাথ পিতার

রেখের যাওয়া ধনসম্পত্তি নষ্ট হতে দেননি, কঠোর পরিশ্রম করে তার পরিমাণ আরও বাড়িয়েছেন এবং এক যোগ্য সহধর্মিণীও পেয়েছেন তিনি, দীপ্তিকণা। কি হবে এত টাকা? একটা তো মাত্র মেয়ে। একদিন সরকারি হোমের এক তরুণ সেক্রেটারি বিভাস দত্তের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন কী দৈন্যদশার ভেতর দিয়ে চলছে এই হোমগুলো। তাছাড়া ভবঘুরে আশ্রমগুলোতে ভালো কাজ কিছু করতে যাওয়ার পথেও প্রতি পদে সরকারি নিয়মকানুনের অজস্র বাধা। কতো অযোগ্য অক্ষম ও অসৎ লোককেও যে খুশি করে চলতে হয়। একটি বিশেষ ভবঘুরে আশ্রমে শিশুদের দুবেলা পেটভরে খাবারও দেওয়া হয় না। সরকারই এর জন্য দায়ি, সরকার টাকা ঢালছে কিন্তু সে টাকা যাদের হাতে খরচ হচ্ছে তারা কিভাবে খরচ করছে তার খবর সরকার রাখে না। একটা আশ্রমে হঠাৎই একদিন গিয়ে হাজির হয়েছিল বিভাস দত্ত। ছেলেগুলোর ঘরের চারপাশে এত দুর্গন্ধ যে তাঁকে সারাক্ষণই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রাখতে হয়েছে। সুপারইনটেনডেন্টকে ডেকে পাঠিয়ে জানতে পারেন সরকারের কাছ থেকে প্রচুর টাকা এসেছিল এবং তা খরচও হয়ে গেছে, কিভাবে খরচ হয়েছে তার হিসেব পায়নি সেক্রেটারি। চেয়ারম্যানের কাছে সমস্ত রিপোর্ট জমা দিয়েও কোনও লাভ হয়নি, হয়নি তার একটাই কারণ, পার্টির ফুলটাইম কাজ করা লোককেই ওখানে সুপারইনটেনডেন্ট করে রাখা হয়েছে এবং মাসের পর মাস তাকে মাইনে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে তার খেয়ালখুশিমতো সরকারি অর্থ ব্যয় করে থাকে। চন্দ্রনাথ তাই তাঁর কয়েকজন হৃদয়বান বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শুধু ভবঘুরে অনাথ ছেলেদের জন্যে ওই আশ্রমের পরিকল্পনা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নকে অতি দ্রুত বাস্তবে রূপ দিয়ে ফেলেন। বাধা এসেছে, তিনি নতিস্বীকার করেননি, পার্টির স্থানীয় নেতাদের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্ব যেমন তিনি প্রয়োগ করেছেন তেমনি প্রয়োজনে কিছু কিছু কম্প্রোমাইজও করেছেন, কিন্তু কোনও বড়রকম অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। পিতৃদেবের নাম থেকেই এই আশ্রমের নামকরণ করেছিলেন তিনি 'বোধিদ্রুম'। দীপ্তিকণা বলেছিল, 'নামটা বেশি শক্ত হয়ে গেল না, বিশেষ করে অনাথ আশ্রমের পক্ষে?' চন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'নামটাতে বাবার নাম থাকছে, সঙ্গে একটা বড়রকম মানেও বেরিয়ে আসছে। উচ্চারণটা একটু বিকৃত হয়ে বোধিদুম্মা হবে এই তো?' সেই বোধিদ্রুম সত্যি সত্যিই ওখানকার লোকদের কাছে বোধিদুম্মাই হয়ে গেল। শুরুতে ছিল সাতটা ছেলে, পাঁচ বছব আগে। এখন সেখানে আছে তিপ্পান্নটা ছেলে। যাদের বয়েস আট থেকে সতের আঠের উনিশ। তারা সকালে দুধ পায়, দুবেলা পেটপুরে ভাত খায়, দুপুরে লেখাপড়া শেখে, হাতের কাজ শেখে, ছবিও আঁকে, গানও গায়, এ পর্যন্ত পাঁচ বছরে পালিয়ে গিয়েছে মাত্র সাতটা ছেলে। যারা শেখায় তারা সকলেই বাঁশবেড়িয়ার আশপাশেরই লোক, লোক মানে সকলেরই বয়েস পঁয়তিরিশের নীচে, ফ্রি সার্ভিস নয়, বিনা পারিশ্রমিকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে লোকের শ্রম নিংড়ে নেয়া নয়, একটি ছেলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ পাশ করে মেমারি কলেজে অধ্যাপনা করে, চিন্ময় গুহ, সে ওখানে ছেলেদের সপ্তায় তিনদিন ইংরেজি পড়ায়। দীপ্তিকণার ইচ্ছে ছিল মেয়েদের এখানে শিক্ষকতার কাজে লাগাবার, কারণ বাঁশবেড়িয়া থেকে বেশ কিছু মেয়ে বহুদূর গিয়ে লেখাপড়া শিখেছে, তারা এরকম একটা জায়গায় কাজ করুক। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কোনও মেয়ে কাজের লোক কিংবা মেয়ে-শিক্ষক রাখা চলবে না, এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়, সরকারি নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় সরকারের সঙ্গে অলিখিত চুক্তিটি ছিল। তাই চন্দ্রনাথের ইচ্ছে থাকলেও বাঁশবেড়িয়ার নানা গুণসম্পন্ন মেয়েরা এখানে কাজ করতে পারে

না। চন্দ্রনাথের হাতে হাজার হাজার টাকা ডোনেশান দেবার লোকের অভাব নেই।

রাত্তিরে খাবার পরে খবরের কাগজ পড়েন চন্দ্রনাথ। সেইসময় তাঁর ঘরে এসে ঢোকে ঊর্মিলা।

'কিছু বলবি ঊর্মি?'

'হ্যাঁ।'

'কি বল।'

'একটা রাস্তা আছে বাবা।'

'কিসের রাস্তা?'

'সুকান্তকে বাঁচাবার।'

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপচাপ খবরের কাগজে একটি মেয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন, একুশ বছরের একটি মেয়ের দিকে, আজ তার মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হলো, ছবির নীচে লেখা, 'নয়ন সমুখে তুমি নাই', তারপর আরও অনেক কথার শেষে লেখা, 'আজ পূর্ণিমার চাঁদের দিকে চেয়ে আমরা তোমার বাবা মা তোমার সেই আলোয় ভরা মুখের খিলখিল হাসি শুনতে পাবো।'

চন্দ্রনাথ নিজের মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে যেন কথা বলতে পারছিলেন না। মাথা নিচু করেই জিজ্ঞেস করলেন, 'যার বাবা দেশের কাজ করছে তার ছেলেকে আমরা কি করে বাঁচাবো মা? বাঁচাবার কথা তার বাবার।'

'ওকে বোধিদ্রুমে পাঠিয়ে দাও।'

'ওখানে কি করবে ও?'

'ডাক্তারি করবে। তিপ্পান্নটা ছেলের জন্য তোমাদের ওখানে সপ্তায় তো ডাক্তার আসে দুদিন। ও সর্বক্ষণ থাকবে। অনুপম ডাক্তারকে ছাড়িয়ে দাও। তুমি দেখো ছ মাসের মধ্যে ও একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাবে। আমি জানি বাবা ওর মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে দেখা যায় না। ডাক্তারি পড়ার থার্ড ইয়ারে ওর মা মারা যায়, ওর মা মারা যাওয়ার তিন মাস পরেই ওর বাবা সুকান্তর আপন ছোটমাসিকে বিয়ে করে। এই ছোটমাসি আর সুকান্ত একই বয়সী।'

'ডাক্তারিতে এত ভালো রেজাল্ট ও করল কি করে?'

'সুকান্ত বলে, ওর ব্রেনের খানিকটায় আছে স্বামী বিবেকানন্দ, খানিকটা ক্রিস্টোফার কডওয়েল।'

'তুই শুয়ে পড় মা। তুই যা চাস তাই হবে।'

ঊর্মিলা চলে যায়। খবরের কাগজে ওই মেয়েটির ছবির দিকে চন্দ্রনাথ আবার চেয়ে থাকেন, ভাবতে থাকেন, ওই 'তুমি' কথাটা কে বলছে? বাবা মা কি বলেন? আসলে 'নয়ন সমুখে তুমি নাই' এটাই আসল কথা, কে বলছে সেটা বড় কথা নয়, 'নও ছবি নও ছবি নও শুধু ছবি।'

'কাকে শাস্তি দিচ্ছো তুমি? নিজেকে।'

'শাস্তি তো নয় ঊর্মি, আমার যে নেশা করতে ভালো লাগে।'

'লাগে না, লাগতে পারে না। ওই নেশাগুলো করো বলেই তোমার জিবে কোনও স্বাদ থাকে না। একজন ডাক্তার হয়ে তুমি জানো না যে অসুস্থ মানুষ সামান্য একটু খাবারের জন্যে ভেতরে ভেতরে কিরকম ছটফট করে, যে লোকটা দুদিন পরে মরে যাবে, নল ঢুকিয়ে তার পেটে খাবার পাঠানো হয়। আর তুমি, সন্ধের পর কোনও খাবার তুমি খেতে পারো না, তুমি জানো না টক ঝাল মিষ্টির তফাত কি। আর নয় সুকান্ত, বোধিদ্রুমে গিয়ে কয়েকটা দিন শুধু তুমি বেড়াতে

যাবার মতো করে কাটিয়ে এসো। বাবা ওখানে মাসে দুতিনবার যায়। আমি বাবার কাছ থেকে জেনে নেব তুমি কেমন আছো।'

'তুমি যাও না ওখানে?'

'যাই, বছরে একদিন, বোধিদ্রুমের প্রতিষ্ঠার দিনটায়।'

'আমি যেতে পারবো না ঊর্মি।'

'এটাই তোমার শেষ কথা?'

ডাক্তার সুকান্ত চক্রবর্তী কোনও উত্তর দিতে পারে না। সামনে একটা গাছের দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ এই গাছটা তার চোখে পড়ল কেন? এতদিন তো মনে হচ্ছিল কলকাতা শহরে কোথাও কোনও গাছ নেই। রেড রোডের পাশ দিয়ে হেঁটে আসার সময় দু ধারের গাছগুলোকে কেন তার মনে হচ্ছিল না গাছ বলে? গাছ কি তার কাছে অরণ্য কেবল? মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রহস্য কি কিছু জানা হলো না? জানতে কি চেয়েছে কিছু?

'বোধিদ্রুমের ভেতরে কতো যে অসংখ্য গাছ আছে তুমি ভাবতে পারবে না। যে গাছ তুমি দেখতে চাও সেই গাছ। যাও সুকান্ত, ভালো না লাগলে তোমার যখন ইচ্ছে তুমি ফিরে এসো।'

'আমার জন্যে বাবা মার কাছ থেকে তোমাকে দূরে সরে যেতে হবে ঊর্মি।'

'সেটা হলে তো আরও আগেই হতো। সেদিন আমাদের ঘরে একটা খাবারও তুমি হাতে তুলতে পারোনি।'

'যদি না যাই?'

'তাহলে রাত্রিবেলা সব রাস্তা হারিয়ে ফেলে আমার বাড়ির রাস্তাটাও আর খুঁজে পেও না।'

তিনদিন পরেই সুকান্ত চলে আসে কনকপুরের 'বোধিদ্রুম'-এ। পাঁচিল ঘেরা একটা বাড়ি। একটা বাড়ি নয়, একটা আম জাম কলা নারকেল পেয়ারা জামরুল গাছে গাছে ছেয়ে যাওয়া বাগান। তার ভেতরে ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ি। সকাল নটা থেকে দশটা, আর দুপুর তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটা সে তার চেয়ারে বসে। তার জন্যে যে দুখানা ঘর তার মধ্যে আসলে চারখানা ঘর হতে পারে। এরই একটায় সে আশ্রমের ছেলেদের শরীর পরীক্ষা করে। ছেলেরা তাকে দেখিয়ে যায় তাদের পেট, জ্বর, ঘা, গলাব্যথা, টনসিল, ফোড়া, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, জন্ডিস যা কিছু হয়।

ছেলেদের খাবারের দায়িত্বে আছে জনার্দন, সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত সবরকম খাবারের ব্যবস্থা জনার্দনের হাতে। নিজেই সে রান্না করে। তাকে সাহায্য করে গোপাল। ভোর পাঁচটার সময় জনার্দন এসে হাজির হয়, বাড়ি ফেরে রাত নটায়। আশ্রমের কাছাকাছিই তার বাড়ি। বোধিদ্রুমের কর্তৃপক্ষ জনার্দনকে আশ্রমের ভেতরেই থাকতে বলেছিল, জনার্দন রাজি হয়নি। এক ছেলে, মা আর বউ নিয়ে জনার্দন থাকে তার নিজের ভিটেতে। সুকান্ত তাকে জিজ্ঞেস করেছে সে সপরিবারে এখানে থাকে না কেন? জনার্দন বলেছে, বাপদাদার ভিটে, পরিবার না থাকলে সাপখোপে ভরে যাবে বাবু। কিন্তু জনার্দনেরও জানতে ইচ্ছে করে, সন্ধের পর আপনি এরকম হয়ে যান কেন? তখন আপনাকে চিনতে পারি না কেন? সরকারি আশ্রম হলে এখানে তো আপনার চাকরি থাকতো না বাবু।

জনার্দন সৎ লোক, তিপ্পান্নটা ছেলে, সে নিজে, গোপাল, মালী, আরও দুজন, এই আটান্নটা লোকের রান্না সে করে, চাল তরিতরকারি মশলা আলু মাছ সব সেই জোগাড় করে। বড় বড়

হাড়ি কড়াইগুলো মেজে দেয় মালী, তার নামই বনমালী। আশ্রমের গাছপালা থেকে ফলমূল চুরি হয় না, ভবঘুরে অনাথ ছেলেগুলোকে চোরেরা থানা পুলিশের চেয়ে বেশি ভয় পায়। ছেলেরা নিজেদের থালাবাসন নিজেরা ধোয়। বাধ্য ছেলে যেমন আছে অবাধ্য ছেলেরও অভাব নেই। তবু সকলেই একটা মোটামুটি শাসনের মধ্যে থাকে। সে শাসন কর্তৃপক্ষের যতখানি জনার্দনের তার চেয়ে অনেক বেশি। শাসনের রুগ্নতাকে এখন সুস্থ করে তোলে ডাক্তার সুকান্ত, ছেলেরা আগের চেয়ে আর একটু স্বাধীন। দিনের বেলা খায় সুকান্ত। কিন্তু রাত্তিরে যে খায় না সেটা জনার্দন জেনে গেছে। খায় না মানে খেতে পারে না। 'এই ডিমটা একটু সেদ্ধ করে দেবে?' জনার্দনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সুকান্ত তাকিয়ে থাকে তার উত্তরের জন্যে।

'আপনার টেবিলের ওপর তো খাবার ঢাকা দেয়া আছে।' গলা দিয়ে যখন একটাও শব্দ বেরোতে চায় না তখন কেন যে এরা কথা বলতে চায়? মানুষ কি আর মানুষ থাকছে না? মানুষ কি অন্য কিছু হয়ে যাচ্ছে? জনার্দনের তো অন্য কিছু হবার কথা নয়। জনার্দনের মতো মানুষ তো সে দ্যাখেনি কখনও। সে জনার্দনও কি তার কথা শুনতে চায় না? স্টোভটা জ্বালিয়ে ডিমটা সেদ্ধ করে দিবি কি দিবি না বল। কে তোকে জিজ্ঞেস করেছে খাবার ঢাকা দেয়া আছে কি নেই? তুই তো শুধু রাঁধতে জানিস। আর কিছু তো তোর জানার কথা নয়। তোকে বড় বেশি ভালোমানুষ ভেবে ফেলেছিলাম। মুর্খ, তোকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় আমার নেই। তুই কি করে জানবি এই ধবধবে সাদা ডিমটার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব ক্ষিদে কেমন কুসুমের রঙে হলুদ হয়ে আছে?

'এই নিন ডাক্তারবাবু।'

হাতটা তুলতে পারে না সুকান্ত। জনার্দন তার হাতে প্লেটটা বাড়িয়ে ধরে ব্যর্থ হয়। সেদ্ধ ডিমটা নুন মাখিয়ে চামচ দিয়ে কেটে তার মুখের মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা করে। দাঁতে দাঁত লেগে আছে। তলার ঠোঁটটা আরও নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। সুকান্ত চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে যায়। জনার্দন তাকে তোলার জন্যে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। পারে না। বাঁ হাতটা আটকে গেছে বুকের তলায়। জনার্দন ভয় পেতে থাকে। বনমালীকে ডাকার সাহস পায় না। যদি জেনে ফেলে? ছেলেদের কাউকে তো ডাকাই যাবে না। এ অবস্থায় কেউ ওকে দেখলে চলবে না। যেমন করে হোক একাই ওকে তুলতে হবে। কিন্তু আর দু একমিনিট পরেই তো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবুর ঘরের এদিকটায় অবশ্য কেউ আসে না। চারপাশটা গাছপালায় ঘেরা। বাইরে অন্ধকার। এখানে একশো পাওয়ারের বাল্ব চল্লিশের মতো জ্বলে। ঘরের আলো বাইরে এসে পড়ে না। শেষ পর্যন্ত বুকের তলা থেকে বাঁ হাতটা জনার্দন বের করে আনতে পারে। কোনওরকমে ওকে তুলে এনে বিছানায় ফেলে দেয়। জনার্দন চলে যায়।

ঘণ্টা তিনেক পরে চেতনা ফিরে আসে। সুকান্ত বিছানা থেকে উঠে মাথায় জল ঢালে, চোখেমুখে জল দেয়। একটু যেন ক্ষিদে পায়। টেবিলের সামনে এসে ঝুড়িটা তোলে। থালায় ভাতের ওপর হাতের পাঁচটা আঙুল বুলিয়ে টের পায় ঠাণ্ডা, একেবারে জলঢালা ভাতের মতো ঠাণ্ডা। সাড়ে আটটার সময় জনার্দন ভাতটা রেখে গেছে। বারান্দায় শুয়ে আছে জিরাফ। থালার ভাতটা ডাল মাছ তরকারি দিয়ে মেখে নেয় সুকান্ত। ভাতটা এনে এক কোণে শুয়ে থাকা জিরাফের মুখের সামনে মাটিতে ফেলে দেয়। কোনও কুকুরের এত লম্বা গলা কখনও দ্যাখেনি সুকান্ত। তাই প্রথমদিন এখানে এসেই সুকান্ত ওর নাম দিয়েছিল জিরাফ। ভবঘুরে আশ্রমের এই কুকুরটাও সারাদিন ভবঘুরে। রাত হলে ঠিক ফিরে আসে সুকান্তর ঘরের সামনে।

টেবিলের ওপর একটা বাটি দিয়ে ঢাকা ছিল সেদ্ধ ডিমের দুটো টুকরো। তার নেশার জিনিসগুলোর মতোই সেদ্ধ ডিমও তার একেবারে নিজের জিনিস। একটা টুকরো একেবারে চেপ্টে গেছে, অন্যটা মুখে দিয়ে ভারী ভালো লাগল। পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু খাবারটা সমস্ত জিবের ওপর যেন মিটিয়ে দিতে লাগল অনন্ত ক্ষুধা। প্রায় রোজ রাত্তিরেই সে খাবার ফেলে দেয়। কিন্তু রোজই রাত্তিরে জনার্দনের কাছে একটা হাঁসের ডিম বাড়িয়ে ধরে সুকান্ত বলে, 'এই ডিমটা একটু সেদ্ধ করে দেবে?' এই ডিম এই আশ্রমের নয়। এটা জনার্দনের বাড়ির। এর জন্যে সুকান্ত তাকে আলাদা টাকা দেয়। জনার্দন কিছুতেই নেবে না। সুকান্ত বলেছে তাহলে ডিম যে আমার খাওয়া হবে না। জনার্দন তাই টাকা নিতে বাধ্য হয়। ডাক্তারবাবুর ঘর থেকে তার রান্নাঘর বেশ খানিকটা দূরে। একটা ডিম সেদ্ধ করার জন্য ডাক্তারবাবু রোজ আসে কেন জনার্দন কিছুতেই তা বুঝতে পারে না।

সকালে সে একেবারে অন্য মানুষ।

অনাথ আশ্রমের, বোধিদ্রুমের ছেলেরা একে একে আসে। সুকান্ত খুব যত্ন করে ওদের দেখতে থাকে। ওদের গলায়, পেটে, গালে, চিবুকে হাত দিয়ে সুকান্ত অতি দ্রুত এক দক্ষ ডাক্তার হয়ে ওঠে। যার যে ওষুধ দরকার খসখস করে কাগজে লিখে ফেলতে থাকে। শুধু যে লিখে দেয় তা নয়, তারা সে ওষুধগুলো পাচ্ছে কি না তার খোঁজ নেয়। লোক পাঠিয়ে কলকাতা থেকে ওষুধ আনায়। ছেলেদের রোগ দ্রুত সেরে যায়। নিজের ঘরে ফিরে এসে সুকান্ত ভাবতে থাকে, এই ছেলেরা অনাথ কেন? কারা এদের জন্ম দিয়েছে? কেনই বা পথে ফেলে গেছে? পথে ফেলে গেছে কেউ, কেউ বা পালিয়ে এসেছে, মুনাব্বরের নাকি বাড়ি ছিল লখনউ। লখনউ থেকে কলকাতার মাঝেরহাট স্টেশনে সে এলো কি করে? সে বলে তার মার সঙ্গে সে নাকি পার্কসার্কাস বলে একটা জায়গায় এসেছিল, একদিন সন্ধেবেলা পুলিশের ভ্যান তার মাকে তুলে নিয়ে গেল, তারপর অনেকদিন কলকাতার এখানে সেখানে ভিক্ষে করতে করতে তার দিন কাটছিল, গজলের ভাঙা ভাঙা টুকরো শোনাতো রাস্তায়, একদিন মাঝেরহাট স্টেশনে বসে ওরকম গাইছিল। তখনই এক বেগম ওকে তুলে নিয়ে গেল তার বাড়ি, সেখান থেকে এখানে এই বোধিদুম্মায়। এখানে ওর ভালো লাগে না। ও একদিন পালিয়ে যাবে এখান থেকে। বছর পনের ষোলো বয়েস।

'কেন, এখানে ভালো লাগে না কেন?'

'আমার যে ভীষণ মার কথা মনে পড়ে।'

'মার খোঁজ কেউ দিতে পারল না তোমায়?'

'না।'

'মার কথা তুমি কাকে বলেছিলে?'

'বেগমকে।'

'কি বললেন তিনি?'

'বললেন, এখানে যে গান শেখানো হয় সে গান তোমার ভালো লাগবে না। কিন্তু তুমি বড় গায়ক হবে। একদিন হঠাৎ তোমার মা তোমার কাছে এসে হাজির হবে তোমার গান শুনতে।'

গিরিশ চক্রবর্তীর ছেলে সুকান্তর তখন তার ছোটমাসির কথা মনে পড়ে। কোনওদিন তাকে সে মাসি ডাকেনি। ডাকত নাম ধরে, স্বাতী বলে। সে যে কেন তার দিদির মৃত্যুর তিন মাস

পরেই তার স্বামীকে বিয়ে করে ফেলল।

অন্যদিনের মতোই রাত নটায় চলে গিয়েছিল জনার্দন। বাড়ি ফিরেই দ্যাখে ছেলে কাঞ্চনের গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে, ভুল বকছে, একেবারে বেহুঁশ। এত রাতে ডাক্তার পাবে কোথায়? জ্বর নাকি বিকেল থেকে কেবল বেড়েই চলেছে। পাশেই থাকে মনোহর, সাইকেল রিকশা চালায়। জনার্দন গিয়ে তাকে ডাকে। 'তুই রিকশা নিয়ে বোধিদুম্মায় চল, ডাক্তারবাবুকে আনতে হবে। না হলে কাঞ্চন আজ রাতেই মরে যাবে।'

মনোহর রিকশা বার করে।

চেয়ারে বসেছিল সুকান্ত। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তবু জনার্দন তাকে ছেলের অসুখের কথা বলে।

'তোমার ছেলেকে এখানে নিয়ে এসো। আমি তো যেতে পারবো না জনার্দন।'

'ওকে আনতে পারলে তো আনতামই ডাক্তারবাবু। আপনি পারবেন। আমি আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে, আমি রিকশা নিয়ে এসেছি। এখানে কতো ছেলের কতো রোগ সারিয়ে দিলেন আপনি। আপনি না গেলে ও বাঁচবে না ডাক্তারবাবু।'

'তাহলে কাচের আলমারি থেকে ওই ব্যাগটা বার করে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

জনার্দন ব্যাগটা নিয়ে আসে। চেনটা খুলতে বলে সুকান্ত। জনার্দন খোলে। ব্যাগের মধ্যে কি কি জিনিস আছে সুকান্ত হাত দিয়ে দেখে নেয়। আজই এনেছে কলকাতা থেকে।

হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে আসে জনার্দন। অন্য হাতে ডাক্তারের ব্যাগ। মনোহর ডাক্তারের দিকে অবাক হয়ে তাকায়, জনার্দন বলে, 'ডাক্তারবাবু নিজেই অসুস্থ, জোর করে নিয়ে যাচ্ছি।' রিকশা চলতে থাকে। সুকান্ত বলে, 'তুমি ঠিকই বলেছ, আমি আজ সত্যিই খুব অসুস্থ জনার্দন।' জনার্দনের ঘরে এসে ঢোকে সুকান্ত। কাঞ্চনের গায়ে হাত দিয়ে মনে হয় আগুনে হাত দিয়েছে। একটা দুরারোগ্য ব্যাধি আন্দাজ করে সুকান্ত। এ শুধু জ্বর নয়, আর একটা অসুখ থেকে এই জ্বর। ইশারায় ব্যাগটা খুলতে বলে। জনার্দন বুঝতে পারে মনোহর কিছু টের পাচ্ছে। সে মনোহরকে কিছু না বলে নিজের স্ত্রী আর মাকে বলে, ডাক্তারবাবু সবাইকে একটু ঘরের বাইরে যেতে বলছেন। ওরা ঘরের বাইরে এলে মনোহরকেও বেরিয়ে আসতে হয়। ব্যাগের ভেতর থেকে ইনজেকশান বের করে দেয় জনার্দন। সুকান্তর হাতে সিরিঞ্জটা কাঁপতে থাকে। যে ইনজেকশানটা বার করতে বলেছে সেটাই কি বার করেছে জনার্দন? সুকান্ত কেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না? কিন্তু ইনজেকশান তো ওকে দিতেই হবে। মরুক বাঁচুক যা হয় হোক, জনার্দন ওর রোগ জানে না।

মনোহর একাই ডাক্তারবাবুকে পৌঁছে দিতে চায়। জনার্দন জানে পারবে না, সে সঙ্গে না থাকলে মনোহর সব বুঝে যাবে, সব জেনে ফেলবে। এভাবে মনোহরের সঙ্গে ওকে ছেড়ে দেয়া যায় না। ফলে ডাক্তারবাবুর পাশে রিকশায় উঠে আসে জনার্দন, উঠে আসে মানে ডাক্তারবাবুকে ওঠায় জনার্দন। ফেরার পথে মনোহর বারবার বলার চেষ্টা করে, 'তুমি যতই বলো জনাদা, ডাক্তারবাবুকে আমার বেসামালই মনে হলো। কলকাতার ডাক্তার, সন্ধের পর বাবুরা কি আর ঠিক থাকে? ডাক্তারবাবুকে ডেকে কাজটা কি ঠিক করলে?'

গিরিশ চক্রবর্তীর ছেলে, অতএব কলকাতায় খবরটা সকাল দশটার মধ্যেই চলে এলো।

চন্দ্রনাথবাবু আর গিরিশ চক্রবর্তী দুজনে একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। বেরোবার সময় চন্দ্রনাথ উর্মিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই যাবি?' উর্মিলা বলল, 'না।'

সেই রাত্রেই কাঞ্চনকে দেখে ফিরে আসার পর কোনও একটা সময় সুকান্ত আত্মহত্যা করে। থানার বড়বাবু তো সামান্য ব্যক্তি। ডি. এম সুবর্ণ তরফদারের ঘরে এসে ঢোকেন গিরিশ এবং চন্দ্রনাথ। সুবর্ণ বলে, 'জনার্দনের নামে একটা চিঠি রেখে গেছে।' সামনে বসেছিল পুলিশের বড়কর্তা অরুণ ভৌমিক। অরুণবাবু বলেন, চিঠিতে লিখেছে, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ি নয়। জনার্দন তোমার ছেলেকে আমি ভুল ইনজেকশান দিয়েছি, এতে ও মরেও যেতে পারে। ভয় করছে। ভোরের অপেক্ষায় আর থাকলাম না।

কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢোকে জনার্দন, 'ভোরের দিকে আমার ছেলের জ্বর একেবারে নেমে গেল, ডাক্তারবাবু না গেলে ছেলে আমার বাঁচতো না বাবু, কিন্তু ডাক্তারবাবু নিজে এভাবে চলে গেল কেন, রোজ রাত্তিরে আমার ঘরে এসে হাঁসের ডিমটা আমার হাতে দিয়ে বলত, এই ডিমটা একটু সেদ্ধ করে দেবে?'

চূর্ণিত শিরায়

'ছিনতাইটা হয়েছে কোথায়?'

'নীলমণি ভটচায লেনে যে নবগ্রহ মন্দিরটা আছে তার সামনে।'

'চোখ বুজে ভক্তিভরে প্রণাম করছিল, হবেই তো। সান্যালকে ডেকে দিন।'

সান্যাল এলে বড়বাবু তাকে বললেন, 'কোথায় যাবেন, ভালো করে শুনে নিন। নবগ্রহ মন্দিরের উল্টোফুটে দুটো রাস্তা দুদিকে চলে গেছে। একটা রাস্তা শুরু হচ্ছে 'বাদ্যযন্ত্র' বলে একটা দোকান থেকে। দেখবেন ভাঙা তানপুরা-টানপুরা ঝুলছে, ওই রাস্তাটা ধরে এগোবেন। একটা ছোট্ট পার্ক পড়বে। পার্কটা ছাড়ালে একটা মাদার ডেয়ারির পাশে হোমিও ল্যাবরেটরি, রেশন শপ, হাজরা ইলেকট্রিক—ডানদিকে পর পর সাত আটটা কদম গাছ আছে, শেষ গাছটার গায়ে একটা লাল রঙের পুরোনো বাড়ি, ওটা একটা মেসবাড়ি, গাড়ি বারান্দায় কয়েকটা ছেলে সারাক্ষণ ক্যারাম খেলে, পাশে মণ্ডলের চায়ের দোকান, ওখান থেকে রিন্টোকে ধরে আনবেন। হাত কাটা রিন্টো। চলে যান।'

সান্যাল বেরিয়ে গেল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠতেই বড়বাবু বললেন, 'চলে যাচ্ছেন কেন? এক্ষুনি ধরে আনবে। ব্যাপারটা দেখে যান না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সান্যাল ফিরে এলো। সঙ্গে যে যুবকটি রয়েছে তার বাঁ হাতের পাতাটা নেই! বুঝলাম এই রিন্টো। মাঝারি হাইট, কালো, রোগা কিন্তু শরীরে যে প্রচণ্ড শক্তি ধরে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সাদা প্যান্টের ওপর নীল রঙের জামা। তার দুপাশে এসে দাঁড়ায় দুজন কনস্টেবল।

বড়বাবু বললেন, 'হারটা দিয়ে দে রিন্টো।' রিন্টোর গলাটা একটু অস্বাভাবিক শোনায়, 'আমি কিচ্ছু জানি না সার, আমাকে জোর করে ধরে এনেছে।' বড়বাবু চোখের ইশারায় কিছু একটা ইঙ্গিত করলেন, দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে একজন কনস্টেবল রিন্টোর পেছনে গিয়ে তার পাছার ওপরের দিকটায় হাঁটু দিয়ে একটা অদ্ভুত কায়দায় তাকে মারল, রিন্টো মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। বড়বাবু বললেন, 'হারটা তুলে আনুন'।

একজন কনস্টেবল রিন্টোর গলার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা সোনার হারটা তুলে এনে বড়বাবুর হাতে দিল।

আমি বিস্মিত নয়নে চেয়ে আছি বড়বাবুর দিকে।

যেন কিছুই হয়নি, অবাক হবার কিছুই নেই, এমন একটা ভাব বড়বাবুর মুখে, 'দ্যাখেননি রাস্তায় লোকে খেলা দেখায়, সিঙি মাছ, মাগুর মাছ গিলে ফেলছে, সাপ ব্যাঙ গিলে ফেলছে, তারপর ঢকঢক করে সাত আট গ্লাস জল খেয়ে আবার পেট থেকে সব বার করে নিয়ে আসছে। এও সেরকম আরকি। এদের লকারটা থাকে গলার কাছে।'

'আমি তো আপনার গুণে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।'

'আপনি মুগ্ধ হলে তো হবে না, আপনার বান্ধবী, মানে আমার স্ত্রী সে তো ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। রাত্তিরে যখন খেতে আসবেন, ওকে শোনাবেন এই ঘটনাটা। অবশ্য এরকম ঘটনা তো রোজই ঘটাচ্ছি, লাভ হয়নি কিছু।' একটু আগের সেই আত্মবিশ্বাসী মুখে কোথায় যেন একটু হেরে যাওয়ার বেদনা লুকোতে গিয়ে লোকটা তার দুপাটি দাঁত ডানে বাঁয়ে বার তিনেক ঘষে নিলেন।

বড়বাবু হিমাদ্রি বিশ্বাসের ধারণা, তাঁর স্ত্রী কুমকুম ছিল আমার বান্ধবী। এর বেশি তিনি জানবেন কি করে? কুমকুম ছিল আমার প্রেমিকা। আমাদের এক বড়লোক বন্ধু সঞ্জয়দের একটা বাগানবাড়ি ছিল বারাসাতে। আমরা সেখানে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম।

সেখানেই কুমকুমের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। প্রথম আলাপেই আমরা জেনে গিয়েছিলাম দুটি হৃদয় কতো কাছাকাছি হতে পারে, তার সাক্ষী রয়ে গেল এই বাগানবাড়ির প্রতিটি গাছপালা। জীবনে সেই প্রথম আমি দমদম বিমানবন্দর দেখেছি, জীবনে সেই প্রথম আমি একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সকাল থেকে সন্ধে কাটিয়েছি। তখন আমাদের সকলেরই সতের আঠারো বছর বয়েস, সবাই এগোরো ক্লাসে পড়ি। সঞ্জয়দের গাড়িতেই আমরা গিয়েছিলাম। সঞ্জয়ের মুখে কথা আটকে যেত। একবার আটকে গেলে সে শব্দ আর বেরোতো না। ছ'সাত বছর বয়েসে দাদু কিভাবে কথা বলে, সেটা নকল করে সবাইকে দেখাতো। সেটাই ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায়, সঞ্জয় তোতলা হয়ে যায়।

আমাদের অবস্থা ভালো ছিল না। কুমকুমদেরও তাই। ওই বয়েসে বড়লোকের মেয়েদের চেয়ে গরিব মেয়েরাই মন কেড়ে নেয় অনেক বেশি। কুমকুমের সস্তা শাড়িটা কল্পনায় রাজকন্যার শাড়ির মতো ঝলমল করতো। মনে মনে ভাবতাম 'মণিকা জুয়েলার্স'এর সবচেয়ে দামি জড়োয়াটা একদিন কুমকুমের জন্যে আমিই কিনে ফেলব। ভয় ছিল সঞ্জয়কে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, মেয়েদের সম্পর্কে ওর কোনও কৌতূহল নেই, বুঝলাম, ও হীনমন্যতায় ভুগছে। এটা আর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

সঞ্জয়দের একটা বিশাল ভেড়ি আছে হাড়োয়ায়। পশ্চিমবঙ্গে এত বড় ভেড়ি আর কোথাও নেই। ওকে বললাম, 'সঞ্জয়, চলো একদিন হাড়োয়ায় যাই। তোমাদের ভেড়িটা একদিন দেখে আসি।' ও রাজি হয়ে গেল। ওর বুঝতে অসুবিধে হলো না, কুমকুমের সঙ্গে একটা দিন কাটাবার জন্যে আমি ভেড়িটা দেখতে চাইছি।

মাছ যে কতো রকমের হতে পারে সঞ্জয় ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখাল। বলল, 'যাও এবার শুধু তোমরা দুজনে নৌকোয় ঘুরে এসো। আমার একটু কাজ আছে। পাশের দু একটা গ্রামে যেতে হবে।' আমরা নৌকোয় ঘুরতে লাগলাম। মনে হলো এমনি করে এই জলের ওপরে যদি কেটে যেত আমাদের জীবন। নৌকো চালাচ্ছিল আব্বাস। আওরঙজেবের মতো দেখতে। কিন্তু মানুষটা বড় ভালো। আব্বাস বলল, 'তোমাদের সাদি হলে আমাকে ডাকবে তো বাবু? এখান থেকে মাছ নিয়ে যাবো।' মধ্যদিনের সূর্য তখন জলের ওপর থেকে আলো ছিটিয়ে দিচ্ছে কুমকুমের ঠোঁটে নাকে চোখে আর চুলে। চারপাশের প্রকৃতি যেন সমস্ত আকাঙ্ক্ষা উজাড় করে রঙিন হয়ে উঠেছে কুমকুমের শরীরে।

ফ্রিজ থেকে বরফ বার করে আমাদের গ্লাসে তুলে দিল কুমকুম।

আমরা হুইস্কি খাচ্ছিলাম। হিমাদ্রি বিশ্বাস খুব খাতির করছিল। সেদিন রাস্তায় কুমকুম যখন

আলাপ করিয়ে দিল তার স্বামীর সঙ্গে তখন থেকেই আমার ইচ্ছে করছিল একবার এসে দেখে যাবো ওর সংসার, কেমন আছে কুমকুম। কোনও কিছুই ভুলে যাইনি আমি। সেই দিনটা মনে পড়ছিল যেদিন ও আমার কাছ থেকে ফিরে গেল।

'তাই বলে একটা পুলিশকে বিয়ে করতে রাজি হবে তুমি?'

'যার নিজের বিয়ে করার ক্ষমতা নেই তার মুখে কি একথা মানায়?'

'তা হয়তো মানায় না কিন্তু আর কটা দিন অপেক্ষা করলে কি ক্ষতি হতো?'

'যারা অপেক্ষা করার কথা বলে তারা কোনওদিনই বিয়ে করতে পারে না। পারে না মানে, যাকে ভালোবাসে তাকে পারে না, কিন্তু করে, বাবা-মার পছন্দে করে।'

থানায় বড়বাবুর ঘরে বসে এই মদ খাওয়াটা কুমকুম পছন্দ করছে না। বারবারই উঠে চলে যাচ্ছে পাশের ঘরে। পাঁচমিনিটের জন্যও সে স্থির হয়ে বসেনি। বললাম, 'কুমকুম, তুমি কি ভুলে গেলে আমি তোমার কতো পুরোনো বন্ধু?' কুমকুম জবাব দিল, 'আমি পুরোনো কিছু মনে রাখি না। পুরোনো জিনিসে শুধু ধুলো পড়ে।'

মাথাটা অল্প ঝিমঝিম করছে। হিমাদ্রিবাবু বললেন, 'চলুন খেয়ে নি।'

আমি হিমাদ্রি বিশ্বাস আর কুমকুম একসঙ্গে খেতে বসলাম। একটি অল্পবয়েসি মেয়ে পরিবেশন করছে। আমি আশা করেছিলাম ভাতটা অন্তত কুমকুমই দেবে। সেও যে আমাদের সঙ্গে বসে যাবে আমি ভাবিনি, আমি তো অতিথি আজ। খুব সেজেছে কুমকুম। পরনে দামি শাড়ি, চোখে কাজল, যত্ন করে বাঁধা চুল। হাড়োয়ার ভেড়িতে নৌকোয় বসে থাকা সেই কুমকুমের সঙ্গে এই মুখ কোথাও মেলে না।

'বিয়ে করোনি কেন, মনের মতো মেয়ে পাচ্ছো না?' কুমকুমের কণ্ঠে কখনও এত অহংকার ছিল না।

'না, আমাকেই কারো মনে ধরছে না।'

'তুমি এখন কোথায় আছো?'

'কেন, তোমার সামনে।'

'তোমার নেশা হয়ে গেছে।'

'নেশাই যদি না হবে মদ খাবো কেন?'

চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিলেন হিমাদ্রি বিশ্বাস। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি অনুপম রায়কে চেনেন?'

কুমকুমের পাল্টা প্রশ্ন 'এত লোক থাকতে অনুপম কেন?'

'একদিন ওকে তোমার মাস্টারের গান শোনাবো, বড় দরাজ গলা লোকটার।'

বিদ্রূপ লুকোতে পারে না কুমকুম, 'তুমি শুনবে গান?'

'শুনবো না, শোনাবো। তোমার পুরোনো বন্ধুকে শোনাবো তোমার নতুন বন্ধুর গান।'

আমার বাবা ছিল রেলের সামান্য কেরানি। আমি বেকার। দেড়খানা ঘর। দুই বোন। কি করার ছিল আমার?

কুমকুম কিছু বুঝতে চায়নি। আসলে ওরও উপায় ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে ওর বাবা মারা গেছে। কুমকুম আর তার মা থাকতো ওর এক মাসির কাছে। মাসি চাকরি করতো। তারই টাকায় সংসার চলতো। কুমকুম দু একটা টিউশানি করতো। আমাকে সিগারেট কিনে দিতো, রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেত। বলত, 'তুমিও তো পড়াতে পারো।' আমার ইচ্ছে করতো না। কুঁড়ে ছিলাম। অলস

দিন কাটানোর মধ্যে একটা নীরব আনন্দ আছে। সব আনন্দ সকলকে দেখানো যায় না। মাসিও বিয়ের চেষ্টা করছে। কুমকুম আমাকে চাকরি খোঁজার জন্যে তাড়া লাগায়।

তেমন যোগ্যতা হয়তো আমার ছিল না। কিন্তু একটা মেয়েকে আমি জয় করে নিয়েছিলাম। সেই মেয়েটি আজ তার জীবন থেকে সমস্ত অতীতটাকে মুছে ফেলেছে।

ওর বিয়ের পর আমি একটা কারখানায় কাজ পেয়ে গেলাম। রিষড়ায়। মন্দ কাটছিল না।

পরদিন ময়দানে পুলিশ ক্লাবের পাশে খোলা আকাশের নীচে ঘাসের ওপর বসে আমি হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে মদ খাচ্ছিলাম। দ্বিতীয় দিন আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার সাহস হয়নি তাঁর।

'আপনি কি জানেন, আমার ভয়ে গোটা এলাকা কিরকম তটস্থ থাকে? অথচ আমার স্ত্রী আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয় না। কাল আপনাকে আমার বাড়িতে কেন খেতে বলেছিলাম জানেন?'

'কেন?'

'আমি দেখতে চাইছিলাম আমার স্ত্রী তার পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে। দেখলাম, আপনি আসাতে ও খুশি হলো না। কেন জানেন? আপনি গিয়েছেন আমার কথায়। ও কিন্তু আপনাকে যেতে বলেনি। একবারও বলেনি। আমার কোনও বন্ধুবান্ধব ও সহ্য করতে পারে না। আর এতে ইন্ধন জোগাচ্ছে একটি লোক, তাব নাম অনুপম রায়। একসময় নকশাল করতো। জেলও খেটেছে। পরে ছাড়া পেল। এখন গান শিখিয়ে পেট চালায়। কুমকুমের কাছে নিয়মিত আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান করে। আমি একদিন বলেছিলাম, ও যদি এখানেই এত সময় কাটিয়ে দেয়, অন্য জায়গায় যায় কি করে? কুমকুম রেগে গেল। বলল, 'ও যখন যেটা করে, তখন সেটাতেই ডুবে থাকে, অন্য সব ভুলে যায়।' আমি জানি এই লোকটাই আমার সম্পর্কে ওর মনের মধ্যে একটা ঘৃণা ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

আমি হিমাদ্রিবাবুর কথা শুনছিলাম। তাবুর সামনে একটার পর একটা স্কুটার এসে থামছিল। হিমাদ্রিবাবু খুব তাড়াতাড়ি খান। আমি সোডা ঢালছিলাম। ঘাসের গন্ধ, সিগারেটের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, মদের গন্ধ একসঙ্গে মিশে চলে যাচ্ছিল অন্ধকারের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা বলার জন্যে আমি ছটফট করছিলাম। বলেই ফেললাম।

'হিমাদ্রিবাবু, আপনি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?'

'কি সাহায্য?'

'আজ ন'মাস হলো আমার কারখানায় লক আউট। এত কষ্টে দিন কাটছে, কি বলব আপনাকে। সংসার চলছে বাবার পেনশানে। আমার দুই বোনের বিয়েতে বাবা প্রচুর লোন করেছিল। একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। মার হাজার রকম অসুখ। আপনি যেমন করে পারুন, আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দিন, যে কোনওরকম একটা কাজ।'

'ছাত্র পড়ান না কেন?'

'লেখাপড়া সব আমি ভুলে গেছি। এখন আমি নিচু ক্লাসের ছেলেও পড়াতে পারব না। মনে হয় সব বোধহয় ভুল পড়িয়ে আসব। বই হাতে নিলেই আমার হাত কাঁপতে থাকে।'

হিমাদ্রিবাবু তখন আমাকে যা বললেন তা হলো এই—রিন্টো কোথায় থাকে কাল সকালেই আমি জেনেছি। হারটা নিয়ে ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এরকম মাঝে-মাঝেই ওকে থানায় ধরে আনা হয়। রিন্টোর ধারণা, কেউ একজন আছে যে ওর সম্পর্কে গোপন খবরগুলো থানায়

দিয়ে আসে। সেই লোকটাকে একবার পেলে হয়। ও ছাড়বে না। এই ঘটনাটা কালই ঘটেছে। রাগটা ওর শরীর থেকে যায়নি। ওর রক্ত এখনও গরম হয়ে আছে। এই সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। অনুপমকে আর বাড়তে দেয়া যায় না। এই লোকটার জন্য দিনে দিনে বেড়ে গেছে কুমকুমের সাহস। ও যা খুশি করতে পারে। আমি ওই চায়ের দোকানে গেলেই রিন্টো আমাকে চিনতে পারবে। বাইরের লোকের সামনে বড়বাবু এসব কাজ করে না। ও বুঝতে পারবে আমি বড়বাবুর কাছের লোক। আমার কথা ও বিশ্বাস করবে। আমি শুধু কথায় কথায় বলে দেব ওকে হার ছিনতাই করতে যে দেখেছে তার নাম অনুপম রায়। পরের কাজটা যা করার রিন্টোই করবে।

'এ কি করে সম্ভব? শেষ পর্যন্ত আমাকে এই কাজ করতে হবে?'

'না করলে আপনিই ঠকবেন। আপনার কারখানা আর কোনওদিনই খুলবে না। শিক্ষিত লোক আপনি। কিন্তু আপনি নিজেই বলেছেন, লেখাপড়া আপনি ভুলে গেছেন। কি করবেন তাহলে? আমার সাহায্য পেতে গেলে আমার জন্যও তো আপনাকে কিছু করতে হবে। আমাদের জন্যে কিছু করা মানে এইসবই করা। নকশাল আমলের কথা মনে নেই? ওদের ধরা কি এত সোজা ছিল? উল্টো পার্টির লোকরা তো দিয়েইছে, ওদের দলের লোকরাও খবর দিয়েছে। ইনফর্মার ছাড়া আমরা চলতে পারি না।'

'এ লোকটা তো নিরপরাধ!'

'অপরাধ তো আপনিও কিছু করেননি। আপনি কোনও অন্যায় করেছেন? কারখানার টাকা যারা চুরি করল তারা তো বহাল তবিয়তে আছে, যে যার বাড়ি-গাড়ি করে নিল, তারপর কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দিল। তাদের গেলাসে সোডা ঢালছে তাদের বউরা, আর আপনি ময়দানে বসে চোরের মতো সোডা ঢালছেন আমার গেলাসে।'

'তাই বলে এভাবে একটা মানুষের ক্ষতি করব?'

'আপনার ক্ষতি হয়নি?'

'হয়েছে।'

'তাহলে? আপনাকে নিয়ে কেউ ভাবছে? কাল আপনার বান্ধবী আপনার থালায় ভাত বেড়ে দিয়েছিল?'

'তবু এরকম একটা মিথ্যে আমি বলব কি করে?'

'মিথ্যে বলে না এমন কোনও মানুষ আছে?'

'অনুপম রায় সত্যিই কি আপনার শত্রুতা করছে?'

'ওর জোরেই আমার স্ত্রী আমার শত্রুতা করছে। কেন আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার?'

'আপনাকে বিশ্বাস না করে আমার উপায় আছে?'

'তাহলে কাজে নেমে পড়ুন। কাল সকালেই চলে যান। জায়গাটা নিশ্চয়ই আর বলতে হবে না?'

'যদি ধরা পড়ে যাই?'

'পড়বেন না। আপনার চোখেমুখে এমন একটা সরলতা আছে, যে কেউ আপনার কথা সত্যি মনে করবে। দেখি আপনার মনের জোর আছে কিনা। ধরা পড়ে গেলে বার করে আনার রাস্তাও আমাদের জানা আছে। আমরাই ধরে আনি আমরাই আবার ছেড়ে দি।'

হিমাদ্রিবাবুর ক্ষমতার পরিচয় আমি কালই পেয়েছি।

লোকটা আমার দিকে বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পাপপুণ্য ভেবে আর কোনও লাভ নেই। গত ন'মাস আমি কিভাবে কাটাচ্ছি সে শুধু আমিই জানি। আমার এক বোন এসেছিল তার পাঁচ দিনের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে। আমি তাকে সাত দিনও রাখতে পারিনি। আমার নিজেরই যে ভাত জোটে না। বাড়ি ফিরতেই মা বলল, 'আমরা খেতে পাই না, তুই মদ খাবার পয়সা পাস কোথায় খোকা? দেখিস বাবা, এমন কোনও কাজে জড়িয়ে পড়িস না, যাতে আমরা লোকের কাছে ছোট হয়ে যাই।'

ছোটই তো হয়ে আছি। পালিয়ে বেড়াচ্ছি সুখী মানুষের কাছ থেকে। গিয়েছিলাম একদিন যে ছিল আমার প্রেমিকা তার কাছে। তার কাছে একদিন আমার যে কিছু দাম ছিল কই তা তো কিছুই মনে হলো না।

সকাল এগারোটা নাগাদ ওই রাস্তা ধরে এগিয়ে এলাম।

পেয়ে গেলাম মণ্ডলের চায়ের দোকান। ভেতরে ঢুকে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। রিন্টো এসে ঢুকল। আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছে। সে নিজে থেকেই আমার সামনের চেয়ারটায় এসে বসল।

'পরশু আপনি বড়বাবুর ঘরে বসে ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমার ছোটবেলার বন্ধু।'

'কী সাঙঘাতিক লোক মশাই।'

'কেন?'

'কোমরের ব্যথাটা আমার এখনও যায়নি। কীভাবে মালটা বের করে নিল, দেখলেন।'

'আপনিও তো কম যান না।'

'হ্যাঁ ভেলকি আমরাও জানি। কোন শালা লাগিয়েছে একবার যদি জানতে পারি...'

'আমি কিন্তু জানি ..'

'কি জানেন?'

'কেন বলব আপনাকে?'

'কেন বলবেন? আমরা যার নুন খাই তার গুণও গাই। এই দোকানের মালিক মণ্ডলদা কি এমনি এমনি এখানে বসতে দেয় আমাদের, পুলিশ এত হুজ্জুতি করছে, তবু কিছু বলছে না, কতো টাকা ওর কাছে পাই জানেন?' রিন্টো আমার হাতের ওপর ওর ডান হাতটা একবার বুলিয়ে নিল। জিজ্ঞেস করল ওমলেট খাবো কিনা। বললাম, 'না।' জিজ্ঞেস করলাম, ওর হাত নেই কেন? রিন্টো বলল কালীপুজোর সময় বোমা ফাটাতে গিয়ে ওর হাত উড়ে গেছে। কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি দেখে রিন্টো এক হাতে প্রণাম করে নিয়ে বলল, 'আর যাই করি, মা কালীর নামে আমরা মিথ্যে বলি না।' জানতে চাইলাম, বাড়িতে ওর কে কে আছে। রিন্টো উত্তর দিল, বাবা মা ভাইবোন সবই আছে, ফ্যামিলিটা ওই চালায়।

রিন্টোও তাহলে ফ্যামিলি চালায়?

'খবরটা কে দিয়েছে বলে মনে হয়?'

'জানি না। আমার তো শত্রুর অভাব নেই।'

'অনুপম রায়কে চেনেন?'

'নকশাল অনুপম?'

'এখন আর নকশাল কোথায়?'

'হ্যাঁ, এখন গান শেখায়। ও লাগিয়েছে? ও শালা এত নেমকহারাম?'

'কেন আপনার বন্ধু নাকি?'

'না, না, একবার মোটরের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল। রাত তখন এগারোটা। জোর করে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ড্রাইভারকে কলার ধরে নামালাম। শালাকে আমরাই তখন হাসপাতালে নিয়ে গেছি। ভর্তি করবে না। হাসপাতালের পাঁচখানা কাচের জানালা ফাটিয়ে একেবারে চিনি বানিয়ে দিলাম। নেবে না মানে? ওই হারামির বাচ্চা এত বেইমান?'

'টাকা পাচ্ছে।'

'টাকা এবার পাওয়াবো ওকে।'

অনুপম রায়কে আমি চিনি না।

কোথায় থাকে লোকটা? কতো বয়েস তার? কেমন দেখতে তাকে? কুমকুম ওর কাছে গান শেখে। এ আমি কি করলাম? কেন আমি সাহায্য চাইতে গেলাম একটা থানার বড়বাবুর কাছে? কুমকুম তার স্বামীকে সহ্য করতে পারে না কেন? সত্যিই কি ওই লোকটার জন্য?

সন্ধের পর থেকে আমি এরাস্তা ওরাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রাত দশটায় কলকাতার পথঘাট এত ফাঁকা হয়ে যায় কেন? এই বড় বড় ল্যাম্পপোস্টগুলো সব তো নতুন বসানো হয়েছে, তবু রাস্তার আলো এরকম নিবে থাকে কেন? দোকানপাট এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায় কেন? কোথায় খুঁজে বেড়াবো আমি অনুপম রায়কে? কোথায় তার বাড়ি? কোন পথে ফেরে লোকটা? বড় রাস্তায় ছোট রাস্তায় অলিতে গলিতে আমি হেঁটে বেড়াতে লাগলাম। দেখছিলাম কোনও লোকের পেছনে হাঁটছে কিনা রিন্টো। এ পাড়ায় এত গাছপালা কখনও তো চোখে পড়েনি আমার। এই তো সেদিন কিছু চারা এখানে বসিয়ে গেছে। এরই মধ্যে গাছপালা বড় হয়ে চারপাশে এত ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে? একটা বাড়ির সামনে বেশ কটা খেজুর গাছও রয়েছে। এখানে খেজুর হয়?

দুটো রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল কে জানে।

এখন রাত নটা বাজে। আজ আবার তৈরি হয়েছি। যাকে আমি কখনও দেখিনি সেই অনুপম রায়কে পাহারা দেবার জন্যে যখন আমি বেরোতে যাবো, ঠিক তক্ষুনি একটা লাল রঙের পুলিশের জিপ এসে থামল আমার ঘরের সামনে। একজন লোক নেমে এলো, বলল, 'বড়বাবু এক্ষুনি একবার আপনাকে দেখা করতে বলেছে।' আমি জিপে উঠে এলাম। জিপটা থানার পেছনের গেটে এসে থামল। লোকটা বলল, 'উনি কোয়ার্টারে আছেন।'

তিনতলায় উঠে এলাম।

সেদিন যে মেয়েটি আমাদের ভাত দিয়েছিল সেই দরজা খুলে দিল। আমি ঘরে ঢুকতেই হিমাদ্রিবাবু আমাকে বললেন 'কিছু শুনেছেন?' বললাম, 'না, তো।' ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারের ওপর দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছে কুমকুম। হিমাদ্রিবাবু প্যান্টের ওপর চওড়া বেল্টটা বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'কাল রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় অনুপম স্ট্যাবড হয়েছে। ছোরাটা চালিয়েছে পেটের ওপর। অবস্থা ভালো নয়। ডাক্তাররা চেষ্টা করছেন। বাঁচবে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না।' হিমাদ্রিবাবু কুমকুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমাকে বললেন, 'এখানকার সব অ্যান্টিসোশালকে আমি চিনি। এখন আমি নিজেই বেরোচ্ছি। ফিরতে একটু দেরি হবে। আপনি

একটু বসুন। কুমকুমই আপনাকে খবর দিতে বলেছে। নীচে গাড়ি থাকবে। আমি বলে যাচ্ছি। আপনাকে পৌঁছে দেবে।'

হিমাদ্রিবাবু বেরিয়ে যান।

কুমকুম উঠে আসে। আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। কয়েক সেকেন্ড সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে, 'আজ হল্লাগাড়ি রাস্তা থেকে হকার তুলতে গিয়ে প্রচুর চাল পেয়েছে। বড়বাবুকে দিয়ে গেছে সব চেয়ে ভালো চালটা, চামরমণি। তুমি তো গাড়িতেই যাবে। গাড়িতে দুবস্তা চাল তুলে দেব, নিয়ে যেও। এতে তোমার কিছুদিন চলে যাবে...।'

আমার সামনে সাদা দেয়ালটা ফেটে তখন রক্ত গড়াচ্ছে।

কেন এত ঢেউ

সেন্টের শিশিটা রডোর হাত থেকে মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুকুলিকা ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেয় রডোর গালে। দশ বছরের ছেলেটার ফর্সা নরম গালটা যন্ত্রণায় লাল। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে মুকুলিকা, তার স্বামী বিকাশ রডোর দিকে এগিয়ে আসার সাহসটুকুও হারিয়ে ফ্যালে। রডোর পিতা দীপাঞ্জন অতীব করুণায় ক্ষমাপরবশ, রডোর মা সুমিতা ছেলের হাত ধরে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, দীপাঞ্জনের ডাক শুনে বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়ায়।

'কি করছো কি?'

'কিছু করছি না তো।'

'এভাবে চলে গেলে বিকাশ কি ভাববে বলো তো?'

'ভাবলে ভাবুক, আমি কি করব,...আমার ভয় করছে।'

'কিসের ভয়?'

'আবার যদি কিছু করে?'

'কিচ্ছু করবে না, তুমি ঘরে এসো।'

'ও কোথায়?'

'ভেতরে চলে গেছে।'

'তুমি যাও, আমি ওকে নিয়ে এখানে দাঁড়াচ্ছি।'

'তুমি তো সব জানো, সব জেনেশুনে এরকম ছেলেমানুষী করছো কেন?'

হঠাৎ খুব আস্তে রডোর গলা শোনা যায় 'মা, আমার তো বেশি লাগেনি।'

ছেলের হাত ধরে সুমিতা ঘরে ফিরে আসে। বিকাশ চেয়ারে চুপচাপ আছে। গোলাপ ফুল আঁকা জাপানী প্লেটের ওপর মিষ্টিগুলো যেমন ছিল তেমনি আছে। বিকাশ এই প্রথম কথা বলে, 'রডো খাবারটা খেয়ে নাও।' ভেতরের ঘর থেকে মুকুলিকা আর বেরোয় না। গোল হয়ে চারজনে বসে আছে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। কিছুক্ষণ পর ওরা উঠে পড়ে। মুকুলিকার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দীপাঞ্জন বলে, 'মুকুল আমরা যাচ্ছি কিন্তু।' কোনও সাড়া নেই।

রাস্তায় নেমে বিকাশ সুমিতার হাত ধরে, 'আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি সুমিতা।' বিকাশের জন্য সুমিতার কষ্ট হয়। অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে ইউক্যালিপটাসের সারি। তার পাশ দিয়ে অস্পষ্ট আলোয় ওরা হেঁটে চলেছে। বিকাশ রডোর মুখটা ধরে একটু আদর করে, 'তুমি জানো তোমার নাম রডো কেন?' রডো উত্তর দেয়, 'জানি না।' বিকাশ ওর ছোট্ট হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়, 'তুমি জন্মেছিলে দার্জিলিঙে। সেখানে যে ফুলটা সবচেয়ে বেশি হয়, তার নাম রডোডেনড্রেন, তাই তোমার নাম রডো। নামটা কে রেখেছে জানো?'

'না।'

'যিনি তোমার মাকে দেখেছিলেন তাঁর নাম হচ্ছে ডক্টর ওয়াংদি। টিবেটান ডাক্তার। উনি

রেখেছেন।'

দীপাঞ্জন জিজ্ঞেস করে, 'ডক্টর ওয়াংদি কি বলেছিল মনে আছে বিকাশ?' বিকাশ কখনও কিছু ভোলে না, 'মনে আছে। ছেলে হলে নাম দিও রডো, মেয়ে হলে জিয়া, জিয়া ফ্রম হাইড্রেনজিয়া।' হঠাৎ রডো বলে ওঠে, 'মেয়ে হয়নি কেন?' তার বাবা উত্তর দেয়, 'তুমি হয়েছ বলে।' এস্ সিক্সটিন ছেড়ে দেয়।

বিকাশ বাড়ির দিকে এগোয়। রাত নটায় সল্ট লেকের আলোগুলো তখন একা একা জ্বলছে, একা একাই জ্বলে, আধুনিক সভ্যতার শান্ত প্রহরীর মতো জ্বলে। সন্ধের পর লবণ হ্রদটাকে মনে হয় কলকাতা থেকে অনেক দূরের একটা শহর। যে বাড়িটাকে মনে হয় সবচেয়ে সুন্দর, হঠাৎ চোখে পড়ে তার পাশেই আর একটা বাড়ি বোবা অহংকারে উদ্ধত, ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে শুস্তার জলে স্নান করতে নামা যে সুন্দরীদের বর্ণনা আছে, এখানকার অনেক বাড়িতে যেন সেই মায়াময়ীরাই থাকে। ছেলেমেয়েরা পরের দিনের পড়া তৈরি করে নিঃশব্দে, কোথাও কোনও টেলিভিশন চলছে কি না বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কোথাও কোনও বাড়িতে অনেকগুলো লোক একসঙ্গে হেসে ওঠে না, এখানে যে যার সংসার আড়াল করে বোগেনভেলিয়ায়, সারাদিন শুধু বাড়ি তৈরির শব্দ হয়, কোথাও মৃত্তিকা নেই, সন্ধ্যা নামে অশরীরী।

সমস্ত ঘরে সেন্টের গন্ধ ভাসছে বিষণ্ণ।

মুকুলিকা খাটের ওপর বসে আছে। তার চোখেমুখে কোথাও অপরাধের চিহ্ন মাত্র নেই। সে যে কোনও অন্যায় করেছে মনেই হয় না, শুধু নীরবে ঘুরতে থাকা ফ্যানের নীচে তার ঘন শ্বাসের শব্দ লক্ষ করার মতো। অবিচলিত মুকুলিকা।

'রডোকে মারলে কেন?'

'সেন্টের শিশিটা ও ভাঙলো কেন?'

'তুমি ওভাবে রেখেছ কেন? যে কারও হাতে লাগলেই তো ভাঙতো।'

'আমি ওকে সহ্য করতে পারছিলাম না।'

'কেন, ও তোমার কি ক্ষতিটা করেছে যে...'

'এত কথা আমি জানি না...তোমার বন্ধুকে বলে দেবে ওরা যাতে ওকে আর কক্ষনো এখানে না আনে।'

'কি বলছো মুকুল? এত নিষ্ঠুর তুমি...'

'হ্যাঁ, নিষ্ঠুর। ওর বয়েসি আমার ছেলেটাকে যখন আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গেল যারা শ্মশানে গিয়ে ওকে পুড়িয়ে ফেললে...তারা...তোমরা খুব দয়ালু তাই না? আমার মনে আছে দীপাঞ্জন ছিল, সুমিতা ছিল...ওরা দাঁড়িয়ে দেখছিল...ওরা নিষ্ঠুর না?'

'তোমার ছেলের কঠিন অসুখ হয়েছিল। বেঁচে থাকলে ও আরও কষ্ট পেত, সে কষ্ট তুমি কি করে সহ্য করতে মুকুল, তাছাড়া ওরা কি করবে, ওদের কি দোষ?'

'ওরা আমার বাড়িতে ওদের ছেলেকে আনবে কেন? জানে না ওকে দেখলে আমার অঙ্কুর কথা মনে পড়ে।'

খাটের পাশে রাখা ছোট টেবিলটার ওপর থেকে অঙ্কুর রঙিন ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে মুকুলিকা ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে, কিছুক্ষণ পর বলতে শুরু করে, তোমাকে কোনওদিন মেরেছি অঙ্কু, বকেছি কোনওদিন, কিন্তু তোমার মতো ছোট্ট ছেলেদের আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না অঙ্কু। তুই চলে গেলি কেন, খুব কষ্ট হচ্ছিল তোর? আমি জানি, আমি তো

দেখেছি সারারাত তোর চোখের পাতা দুটো খোলা, কি দেখছিলি অঙ্কু, আর কোনওদিন কাউকে দেখতে পাবি না তাই সবাইকে রাতভর দেখে নিচ্ছিলি? তোর বাবা আমার কাছে লুকিয়েছিল, তোর কি অসুখ হয়েছিল আমাকে বলেনি। একদিন টিভিতে ডাক্তাররা আলোচনা করছিল, দেখি সব তোর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, যা যা বলছিল ডাক্তাররা, সবই তোর শরীরে তখন দেখা দিচ্ছিল। কিন্তু জেনে লাভটা কি হয়েছে? খেতে কষ্ট হচ্ছিল তোর, এখন আমারও খেতে কষ্ট হয় রোজ, তবু খাই তো, পেট ভরেই তো খাই, তোর জন্যে তো কিচ্ছু রাখি না অঙ্কু...।

হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নেয় বিকাশ। 'তুমি তো এরকম ছিলে না মুকুল, কতো ধীর স্থির শান্ত ছিলে তুমি, সেই তুমি এখন কি হয়ে যাচ্ছো মুকুল?'

'কি হচ্ছি, আমি আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলব না?'

'বলবে, কিন্তু এই ছবির সঙ্গে বলবে না।'

'তাহলে ছবিটা এখানে রেখেছ কেন? ফেলে দাও, ভেঙে ফ্যালো।'

'পাগলামি কোরো না মুকুল। এই ঘরের সব দেয়ালে আমরা অঙ্কুর ছবি টাঙিয়ে রাখব, শুধু অঙ্কুর ছবি। সেই ছবির দিকে চেয়ে আমরা অঙ্কুর কথা ভাববো। কাউকে বলব না। সে আমাদের তিন জনের কথা। অঙ্কু আমাদের ঠিকই, কিন্তু চারপাশে সবাই ওকে ভালোবাসতো, কতো আদর করতো। অঙ্কুর জন্যে আমরা এমন কিছু করব না যাতে লোকে আমাদের ভুল বোঝে। অঙ্কুর জন্যে দুঃখকষ্ট যা কিছু সব আমাদের দু জনের, সেই দুঃখ আমরা কাউকে দেখতেও দেবো না।'

এই মুকুলিকাকে কতবার বলেছে বিকাশ, 'কোনও কালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা বয়সী, হে অনন্তযৌবনা উর্বশী।' আজ সেই উজ্জ্বল বুদ্ধিমতী মুকুলিকা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেয়ালের দিকে। শব্দ গন্ধ স্পর্শের সকল অনুভূতি যেন গাছের শুকনো পাতার মতো ঝরে যায়। ঘরময় সেন্টের গন্ধ।

সবরকম চেষ্টা করেছে বিকাশ। যেখানে যত টাকা আছে সব তুলে এনেছিল। রোগটা যে ছেলেটার শরীরে এত দ্রুত ছড়িয়ে যাবে ভাবতেও পারেনি। তাদের একমাত্র ছেলে অঙ্কন। এগারো বছরে পড়েছিল। কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, রোগটা কি হতে পারে, চিকিৎসা পদ্ধতি থেকেই ধরা পড়ে যাবে অসুখটা কি, ছেলের বাবার সেটা জানার দরকার। বিকাশ কিন্তু বলেনি মুকুলকে।

সেই ইনজেকশানগুলোর কথা ভাবলে ভয়ে এখনও বিকাশের বুক শুকিয়ে যায়। ডাক্তাররা একে অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, তাঁদের সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা প্রয়োগ করেছেন, ছেলেটিকে বাঁচাতেই হবে। ইনজেকশান দেয়ার পর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া অঙ্কুর মুখের দিকে তরুণ সন্ন্যাসীর মতো চোখে তাকিয়ে থাকেন ডাক্তার, তাঁর গলা শোনা যায়, 'সিসটার এক মিনিটের জন্যও কিন্তু বাইরে যাবেন না।' বাইরে রাত বাড়ে ; রুগী আর ডাক্তার দুজনকেই ক্লান্ত দেখায়। বিকাশের পিঠে হাত দিয়ে ডাক্তার বলেন, 'ভয়ের কিছু নেই, আমাদের যা কিছু করার আছে সবই করব।' ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে বিকাশ বুঝতে পারে, দিনে দিনে আত্মবিশ্বাস ক্ষয়ে যাচ্ছে।

এখানকার হাসপাতাল থেকেই ব্যবস্থা করা হলো। ছেলেকে নিয়ে বিকাশ বম্বেতে গেল। ফিরে এলো বারো দিন পরে। কিছু হলো না। ওখানে ডাক্তাররা বলে দিলেন, এখানে আর কিছু

করার নেই, এখন যে চিকিৎসা চলছে তা কলকাতাতেই করা যাবে।

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সোমনাথ চক্রবর্তী এক দু মাস অন্তর যিনি বিদেশ যান, বিকাশ একদিন তাঁকেই বাড়িতে নিয়ে এলো। ঘণ্টা দুয়েক সময় ধরে সব পরীক্ষা করে দেখলেন ডাক্তার চক্রবর্তী। চারদিন তাঁর ওষুধ খাবার পর পঞ্চম দিনে খাট থেকে একবার নামতে পেরেছিল অঙ্কন। মনে হয়েছিল একটা অবিশ্বাস্য অলৌকিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সোমনাথ চক্রবর্তী বলেছিলেন, এ্যালোপাথ ডাক্তাররা রোগটা ধরতে পারেনি, যে অসুখের চিকিৎসা করা হয়েছে অসুখটা তা নয়। কথাটা ডাক্তার সেনগুপ্তর কানে আসে, 'আমি একা ভুল করতে পারি, কিন্তু এতজন ডাক্তার আমরা সকলে মিলে যদি ভুল করে থাকি, তাহলে ধরতে হবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানটাই মিথ্যে। বিজ্ঞান কখনও মিথ্যে হয় না। অঙ্কনের অপারেশন করার আগে আমরা পাঁচজন ডাক্তার একসঙ্গে সব কিছু দেখে নিয়েছিলাম। অপারেশন ছাড়া আর কোনও রাস্তা ছিল না। ডক্টর চক্রবর্তীর ওষুধটাই চলুক। আর সব ওষুধ এখন বন্ধ করে দিন। কটা দিন ওর শরীরটা একটু আরাম পাক। হোমিওপ্যাথে জ্বালাপোড়াটা একটু কম থাকবে, সেই ভালো।'

বিকাশ শুধু ভেবেছিল 'কটা দিন' কথাটা কেন বললেন ডাক্তার সেনগুপ্ত? বেশিদিন ভাবতে হয়নি, এর ঠিক ছ দিন পর রাত একটা কুড়ি মিনিটে অঙ্কুর জ্বালাপোড়া আর একটুও থাকে না। ভোরবেলা অঙ্কুকে নিয়ে যখন ওরা বেরিয়েছে রাস্তার ওপর বমি করে বিকাশ।

টেলিফোন বাজছে। রাত দশটার সময় কে ফোন করছে এখন? বিকাশ বিরক্ত হয়।

'হ্যালো।'

'দাদা আমি মীনা বলছি।'

'বল্।'

'কি হলো, এলি না কেন?'

'কোথায়, তোদের বাড়ি?'

'কেন, বউদি বলেনি?'

'না তো।'

'সে কি! আমি তো সকালে ফোন করেছিলাম। বউদিকে বলে দিয়েছিলাম বাজার থেকে এলেই দাদাকে ফোন করতে বোলো। বাবলুর জ্বর আরও বেড়ে গেছে। আমি তারপর কিছুতেই আর লাইন পেলাম না। ও তো গৌহাটি থেকে পরশু ফিরবে। আমি একা একা কি করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। সন্ধে থেকে জ্বর তো বেড়েই চলেছে।'

'এখন কতো?'

'একশো পাঁচ।'

'ঠিক আছে আমি এক্ষুনি আসছি।'

'এত রাতে ডাক্তার পাবি?'

'পাবো। অতো নার্ভাস হবার কিছু নেই। সুব্রতর গাড়ি আছে, সাড়ে দশটা অব্দি চেম্বারে থাকে, আমি আসছি।'

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে বিকাশ মুকুলিকাকে কোনও প্রশ্ন করে না, জামাপ্যান্ট পরতে শুরু করে। সব কথা শুনেছে মুকুল।

'তুমি যাবে না।'

'যাবো না মানে?'

'ওদের ছেলের জ্বর তো তোমার কি?'
'মীনা আমার বোন, আমার মায়ের পেটের বোন।'
'কিন্তু বাবলু তোমার ছেলে নয়। তুমি যাবে না।'
'যাবো।'
'আমাকে একা ফেলে তুমি চলে যাচ্ছো?'
'তাহলে তুমিও চলো।'
'না আমি যাবো না, যাবো না, কিছুতেই যাবো না।'
বিকাশ কথা বাড়ায় না। ঘর থেকে বেরোবার সময় শুধু বলে 'দরজাটা বন্ধ করে দিও।'
বিকাশ যখন ফিরে আসে তখন রাত সাড়ে এগারোটা। দোতলার বারান্দায় আলো জ্বলছে। সে ওপরে উঠে আসে। দরজা খোলা। প্রথম ঘরটায় আলো জ্বলছে। ড্রয়িংরুমে আলো জ্বলছে। দরজা খোলা। সে ভেতরের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়, সে ঘরটায় আলো নেবানো, একটা চেয়ারে একলা বসে আছে মুকুল, সেই অন্ধকার শরীরের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুই বলতে পারে না বিকাশ। বাবলুর গা পুড়ে যাচ্ছে, মুকুলকে সেটা জানিয়ে কোনও লাভ নেই। মুকুলও কিছু জানতে চায় না।

কি করে দিনগুলো কাটবে?
অঙ্কনের পড়ার ঘরের একদিকে দুটো জানালা। বিকেলবেলা জানালাদুটো মুকুল বন্ধ করে রাখে। কারণ ওই জানালা দিয়ে দেখা যায় পাশের মাঠে বাচ্চা ছেলেরা ফুটবল খেলছে। অঙ্কনের মৃত্যুর পর থেকে এই রোগটা ধীরে ধীরে বেড়েছে। ওর বয়েসি কোনও বাচ্চা ছেলেকে ও সহ্য করতে পারে না। বিকাশ একদিন বলেছে, 'জগতে একমাত্র শিশুরাই কারো শত্রু হয় না মুকুল।' চিৎকার করে ওঠে মুকুল, 'হ্যাঁ শত্রু শত্রু, ওরাই আমার শত্রু, ওরাই আমার অঙ্কুকে কেড়ে নিয়েছে, অঙ্কু মরে গেছে তাতে যেন কারও কিছু যায় আসে না, ওরা ইস্কুল যাচ্ছে, বেড়াতে যাচ্ছে, হাসছে খেলছে, আইসক্রিম খাচ্ছে, কেন, ওরা এত খুশি কেন, ওদের এত আনন্দ কেন, অঙ্কু মরে যাবার পর ওই খেলার মাঠটা বিষ্টিতে ভিজে আরও কতো সুন্দর হচ্ছে দেখেছ, অঙ্কুর জন্যে কারও কোনও দুঃখ নেই. তাই আমি ওদের সহ্য করতে পারি না।'
'কিন্তু তুমি এরকম করলে অঙ্কু কি শান্তি পাবে?'
'অঙ্কু আমার সামনে নেই, অঙ্কু চান করে না, খায় না, ইস্কুল যায় না, পড়তে বসে না...'
'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে আমি জানি মুকুল।'
'আমার সামনে কোনও বাচ্চা আসুক আমি চাই না।'
অঙ্কুর বন্ধু পাশের বাড়ির সিঞ্চন এসে দরজায় কড়া নাড়ে। মুকুলই দরজা খুলে তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে আসে। অন্যমনস্ক বিকাশের মুখে খেলে যায় এক অপ্রস্তুত হাসির শিহরন। মুকুল সিঞ্চনকে একটা চেয়ারে বসতে বলে। সে বসে না। বিকাশের হাতে একটা ক্যালকুলেটর তুলে দিয়ে বলে, 'আঙ্কেল, এটা বাপি দিয়েছে।' বিকাশ ওর পিঠের ওপর আদর করে একটা চাপড় দেয়, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' মুকুল এগিয়ে আসে, জিজ্ঞেস করে, 'সিঞ্চন, অঙ্কু তোমার বন্ধু ছিল, খুব বন্ধু, তাই না?'
'হ্যাঁ, ওই তো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।'
'ওর কথা তোমার মনে পড়ে?'

'রোজই তো মনে পড়ে, বিশেষ করে টিফিনের সময়।'

'কেন?'

'ও তো মিষ্টি খেতো না, তুমি ওর বক্সে যে সন্দেশ দিতে সব আমিই তো খেয়ে নিতাম, কিন্তু অঙ্কু আমার কাছ থেকে কিচ্ছু খেতো না, তাই আমার খুব রাগ হতো...'

'রাগ হতো, অঙ্কুর ওপর তোমার রাগ হতো' মুকুল ওর একমাথা ঝাঁকড়া চুল তার হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে ধরে, বিকাশ দ্রুত এগিয়ে এসে মুকুলের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, পারে না, মুকুল যেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সিঞ্চনের মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। বিকাশ দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে চলে আসে ভেতরের ঘরে, বিছানায় শুইয়ে দিয়ে প্রায় একরকম চেপে ধরে থাকে খানিকক্ষণ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুকুল শান্ত হয়ে যায়। আপনমনে বলতে থাকে, 'অঙ্কুর মাথার চুলগুলো সব উঠে যাচ্ছিল, কালো কালো চুলগুলো সব লাল হয়ে যাচ্ছিল।' বিকাশ বেরিয়ে এসে দ্যাখে সামনের ঘরে সিঞ্চন নেই। মুকুলের ঘুম পাচ্ছে। দরজা খোলা রেখেই বিকাশ বেরিয়ে আসে।

সিঞ্চনের মা ছেলের মাথায় এক টুকরো বরফ ঘষছিল। সিঞ্চনের বাবা একটাও কথা বলে না, বলতে পারে না, যাই বলুক তাতে বিকাশের কষ্ট আরও বাড়বে। সিঞ্চনের মা একাই কথা বলে যায় :

কিছুদিনের জন্য ওকে হাসপাতালে রেখে আসুন...

কোনও মেন্টাল অ্যাসাইলামে...

অন্তত কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে...

এভাবে ওকে তো বাড়িতে আপনি রাখতে পারবেন না...

ভাগ্যিস এটা কলকাতা শহর, গ্রামে এরকম কিছু ঘটলে, এতক্ষণে সবাই ওকে ডাইনি বলত...

অশোক জোয়ারদার নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট।

দু দিন পর বিকাশ তাঁর কাছে আসে। সঙ্গে দীপাঞ্জন। কবে মুকুলকে নিয়ে আসবে সেই নিয়ে কথা বলতে আসে। দীপাঞ্জন ডাক্তারকে জানায়, অথচ এরকম নম্র স্বভাবের ঠাণ্ডা মেয়ে সে আর কখনও দ্যাখেনি। সব কিছু শুনে ডাক্তার জোয়ারদার বলেন, 'চিকিৎসা শুরু করার আগে দুজনে কোথাও ঘুরে আসুন। কোনও পাহাড় টাহাড়ে চলে যান। চারপাশের এই চেনাপরিচিত জায়গাটা থেকে দূরে কোথাও, যেখানে সব কিছু আপনাদের অজানা অচেনা এরকম কোথাও, অন্তত পনের কুড়ি দিন, পাহাড় মানুষকে অনেক বদলে দেয়।'

কত দিন পর এই ঝিলের ধারে দুই বন্ধু আবার পাশাপাশি বসেছে। দীপাঞ্জন বলে, 'এই বর্ষায় পাহাড়ে যাবার কোনও মানে হয় না। বর্ষাকালে পাহাড় খুব সুন্দর ঠিকই, মনে আছে এক ঝলক বৃষ্টি হয়ে যাবার পর কাঞ্চনজংঘা কী দারুণ দেখাত? কিন্তু এখন ওসব দেখছেটা কে? পাহাড়ের বৃষ্টি ওর মন আরও খারাপ করে দেবে। পাহাড় তো তোমাদের ঘোরা আর কিছু বাকি নেই। দার্জিলিঙ যাবার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া মুকুল কোথাও যেতেই চাইবে না।'

বিকাশের মনে পড়ে অমৃতসর থেকে ডালহৌসি পাহাড়, চাম্বা ভ্যালী, মাণ্ডি, কুলুমানালি, রোটাংপাস। দার্জিলিঙ থেকে মিরিক, গ্যাংটক, টাইগারহিল, এমনকি সান্দাকফু। এখন অসম্ভব। কি করে বলবে সে, চলো মুকুল বেড়িয়ে আসি। বিকাশ বুঝতে পারে না, কেন এমন হলো,

কেন এমন হয়। এমনি করেই সবচেয়ে কাছের মানুষকে সবচেয়ে অচেনা মনে হয়। যাকে বিশ্বাস করি, ভালোবাসি, তাকেই একদিন ভয় করি। এমনি করেই মুকুলের মতো হাসিখুশি একটা মেয়ের মাথায় এমন একটা অসুখ ঢুকে যায়। দিনে দিনে নিজের অসুখটাকে নিজেই তো সে বাড়িয়ে চলেছে। তাহলে কি এখন অন্যাকে কষ্ট দিয়ে সে আনন্দ পায়, নিজেকে কষ্ট দিয়ে সে সুখ পায়?

চারদিন পর দীপাঞ্জন একদিন একা আসে।

'কাল রডোর জন্মদিন, সন্ধেবেলা তোমাদের দু জনের নেমন্তন্ন। আর কাউকে বলিনি।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে দীপু?'

'কেন?'

'রডোর জন্মদিনে মুকুলকে নিয়ে আমি যাবো কি করে?'

ভেতর থেকে কথাটা শুনতে পায় মুকুল, সোজা চলে আসে ওদের সামনে।

'যাবো না কেন, নিশ্চয়ই যাবো, রডোবাবুর জন্মদিনে আমরা যাবো না?'

'রডোবাবু' সে এই প্রথম বলছে না। মুকুল ওকে রডোবাবু বলেই ডাকে। দীপাঞ্জন বলে, 'ওর কোনও বন্ধু আসবে না।' অসন্তুষ্ট হয় বিকাশ, 'আমি জানি কেন আসবে না। দীপু, এটা তুমি ঠিক করোনি।'

'তুমি যা ভাবছো তা নয়। আমি ছেলের জন্মদিন করতে চাই না। এসব ওর মার আবদার।'

'কেন জন্মদিন করলে কি হয়?'

'ছেলেরা লোভী হয়। জন্মদিনে লোকে উপহার নিয়ে আসে আর এখান থেকেই লোভটা তৈরি হয়। যে যত দামি উপহার নিয়ে আসে তার সঙ্গে তত ভাব হয়। বছরে এই একটা দিনেই তার ধারণা হয়ে যায় সব কিছু আমার জন্যে। সব কিছু আমাকেই পেতে হবে। কোনও ছেলে কিংবা কোনও মেয়ে কখনও জিজ্ঞেস করেছে দেখেছ, মা তোমার জন্মদিনটা কবে? তবু করতে হবে। আমি সুমিতাকে বলে দিয়েছি এবার কাউকে বলতে পারবে না। শুধু মুকুল আর বিকাশ।'

'আর রডোর বন্ধুরা?'

'না কেউ নয়। ওদের সেকশনে তিরিশটা ছেলেমেয়ে আছে। আমি তিরিশটা 'নদী' কিনে এনেছি।'

'নদী কিনেছ মানে?'

'রবীন্দ্রনাথের 'নদী'। আজ 'বিশ্বভারতী' অফিসে গিয়ে কিনে আনলাম। মূল্য ছ টাকা। রডো কাল সবাইকে একটা করে নদী উপহার দিয়ে দেবে, ব্যাস।'

'নো ক্যাডবেরি?'

'নো। আমি এখন আর বসছি না। আমার একটু কাজ আছে। তোমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি যেও।'

বিকাশ কিছু বলতেই পারে না। মুকুল বলে, যাবো'।

দীপু কেন যে এটা করতে গেল কিছুতেই বিকাশের মাথায় ঢোকে না। সুমিতা কি কোনও প্রতিশোধ নিতে চাইছে? সুমিতা তো সেরকম মেয়ে নয়। সুমিতা তার মনের মধ্যে এরকম কোনও ফন্দি আঁটলে দীপু কি তাকে প্রশ্রয় দেবে? না, কক্ষনো না। দীপু তো দেখেছে অঙ্কুর মৃত্যুর পর থেকে গত এক মাস বাইশ দিন কিভাবে কাটিয়েছে বিকাশ, কিভাবে মুকুলিকার দিনগুলো কাটছে, দীপু তো সবই জানে। অঙ্কুর অসুখের সময় এমন একটা দিন যায়নি, যেদিন

দীপু সঙ্গে ছিল না। দীপু সর্বক্ষণ পাশে পাশে রয়েছে সেটাই তো তাকে ভেঙে পড়তে দেয়নি। সেই দীপাঞ্জন জানে অঙ্কুর বয়েসি কোনও বালকের সামনে আজ আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না মুকুলিকা। সে হিংস্র হয়ে ওঠে। অথচ দীপু এসে রডোর জন্মদিনে নেমন্তন্ন করে গেল। শুধু ওদের দু জনেরই নিমন্ত্রণ। তা কি হতে পারে? সুমিতা কি করে রাজি হলো? কেন বারণ করল না ওকে? নাকি সুমিতাই পাঠিয়েছে? দীপুর এই একটাই দোষ, যা একবার তার মাথায় ঢুকবে সেখান থেকে তাকে আর নড়ানো যাবে না। মুকুলই বা এক কথায় যেতে রাজি হয়ে গেল কেন? কি চায় ও? রডোকে চড় মারাটা কি ভুলতে পারেনি সুমিতা? সেও তো মা। সে কি এতটা ভুল করবে? একবারও কি ভাবলো না ওরা, মুকুল যদি আবার কিছু করে বসে?

'এসো মুকুল' দীপাঞ্জন হাত ধরে ওকে ঘরে নিয়ে আসে। হাত ধরেই ওকে একটা চেয়ারের ওপর বসিয়ে দেয়। বিকাশ সোফায় এসে বসে। এই বিশাল ফ্ল্যাটটা তার কোম্পানি থেকে দিয়েছে। আধুনিক আসবাবপত্রে সজ্জিত ঘর। ঘরের চার কোণে চারটে আলো জ্বলছে, সে আলোয় চোখ ঝলসায় না, হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। এক কোণে যোদ্ধামূর্তি ধরে রেখেছে একটা প্রাচীন ঘড়ি। বিকাশ লক্ষ করছে মুকুলকে। ভয় একটু একটু করে জমছে তার বুক পকেটের নীচে, তার চোখের তলায়, তার দাঁতের গোড়ায়। এক্ষুনি তো বেরিয়ে আসবে রডো। বিকাশ জিজ্ঞেস করে, 'সুমিতা কোথায়?' দীপু উত্তর দেয়, 'কেন, রান্নার গন্ধ পাচ্ছো না?' ঘরে ঢুকেই যার খোঁজ নেয়ার কথা সেই রডোর নামটা কিছুতেই মুখ থেকে বেরোয় না।

আগে মুকুলিকা উঠে যেত। সোজা চলে যেত রান্নাঘরে, সুমিতার হাত থেকে সব কেড়ে নিত, দু জনে দুজনকে সাহায্য করতে গিয়ে সময় লাগাতো দ্বিগুণ। সেই মুকুলিকা এখন চুপচাপ বসে আছে। টেবিলের ওপর আঁকা দাবার ছকে আঙুল রেখে কাল্পনিক দাবা খেলায় মগ্ন। কিন্তু আর কতক্ষণ? যার জন্মদিন সে কোথায়? তার গলাও তো শোনা যাচ্ছে না। কোথায় গেল সে? মুকুলের কাছ থেকে তাকে কি ওরা সরিয়ে নিয়েছে? নিয়ে থাকলে অন্যায় করেছে। বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে অপমান করেছে। দীপু কিংবা সুমিতা কি এটা করতে পারে? হয়তো পারে।

'রডোবাবু কোথায়?'

চমকে ওঠে বিকাশ। মুকুলিকার গলা।

দীপু উত্তর দেয়, 'শাস্তি দিয়েছি।'

বিকাশ কোনও প্রশ্ন করে না।

মুকুলিকাই জিজ্ঞেস করে, 'শাস্তি কেন?'

'বিকেলবেলা খাবারের প্লেটটা ছুঁড়ে ভেঙে ফেলেছে?'

'কেন?'

দীপাঞ্জন জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কি খাবে চা কফি না শরবত?'

বিকাশ কোনও কথা বলতে পারে না। মুকুলিকা বলে, 'শরবত'।

'আসছি, এক মিনিট।' দীপু উঠে ভেতরে যায়।

ফিরে আসে দু মিনিট পরে। হাতে দু গ্লাস শরবত। নীল রঙের গেলাসে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে শরবতের রঙ। দুজনে দুটো গ্লাস তুলে নেয়।

মুকুলিকা আবার জিজ্ঞেস করে, 'প্লেটটা ভাঙলো কেন?'

দীপাঞ্জন বলে, 'স্কুল থেকে এসে খেতে বসেছিল। ওর মাকে বলল, আগে কথা দাও কাল আমায় সাইকেল কিনে দেবে। ওর মা বলল, দেবো। এখন খাও। ও বলল, রোজই তো বলো দেবে, কাল যদি বাবা সাইকেল না আনে আমি কিন্তু খাবো না বলে দিচ্ছি। ওর মা বলল, খেতে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে খাবারের প্লেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।'

'এখন কোথায়?'

'এসো।' দীপু এসে হাত ধরে মুকুলকে তোলে। তৎক্ষণাৎ বিকাশ উঠে আসে, 'না, ও যাবে না।' খুব ঠাণ্ডা গলায় দীপাঞ্জন বলে, 'ভয় নেই, আমি তো আছি।' দরজা পার হয়ে, ছোট একটা বারান্দা পেরিয়ে, দুজনে ভেতরের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে মুকুল দ্যাখে, হাতে পায়ে মোটা দড়ি বেঁধে, সেই দড়ি দিয়েই টেবিলের বিরাট পায়ার সঙ্গে রডোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুকুলের মনে পড়ে এই টেবিলটা যখন কেনা হয় তখন ওরাও সঙ্গে ছিল, তখন সঙ্গে ছিল অঙ্কু। ওপরে জ্বলছে একটা ল্যাম্প, ল্যাম্পের আলো কাত হয়ে এসে পড়েছে মেঝেতে চোরের মতো বেঁধে রাখা রডোর মুখে, লালচে ঘাম নামছে তার কপাল থেকে।

মুকুলিকা এগিয়ে আসে। মেঝের ওপর ব'সে ধীরে ধীরে রডোর হাত পায়ের দড়িগুলো খুলে ফ্যালে। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের মধ্যে, দীপাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার শরবতটা নিয়ে আসুন।'

বিস্মরণ

না, এ গয়না আর উদ্ধার করা যাবে না। ফেরৎ পাবার কোনও রাস্তা নেই।

লকার থেকে অবনী একটা হিরের আংটি আনতে গিয়েছিল। দুজনে পরপর সই করেছে একসঙ্গে ঢুকবে বলে। হঠাৎ শমিতার গা গোলাতে থাকে। সে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে। ভেতরে ঢুকেছিল কিনা মনে নেই। অনেক গয়না ছিল লকারে। তখন কিচ্ছু নেই। একেবারে শূন্য লকার। শূন্য ঠিক নয়, গয়না যাতে রাখা ছিল সেই কৌটোগুলো রয়েছে, গয়নার কয়েকটা বাক্সও রয়েছে, সব খালি। বাড়িতে দুটো ছোট দুল, দুএকটা আংটি, একটা সরু চেন এছাড়া আর কিছু নেই। বিয়ের সময় একমাত্র মেয়েকে মা তাঁর সর্বস্ব দিয়েছিলেন। মা তাঁর বিয়েতে ওর দিদার কাছ থেকে যে মহামূল্যবান জড়োয়ার সেটটা পেয়েছিলেন, সেটাও ছিল ওই লকারেই। বালা, কংকন, চিক্, চুর, বাউটি, রতনচূড়, নেকলেস, চন্দ্রহার, ব্রেসলেট, আটখানা সলিড সোনার চুড়ি কি না ছিল ওই লকারে। শমিতার কিছু মনে নেই। কিন্তু ওর মা শেফালিকার যে সব মনে আছে। ইউনিট ট্রাস্টের কাগজ, এন. এস. এসের বই, ইন্দিরা বিকাশ, ন্যাশনাল সেভিংস-এর সার্টিফিকেট কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাঙ্কের জয়েন্ট এ্যাকাউন্টে চোদ্দশ টাকা পড়ে আছে। অন্য ব্যাঙ্কেও তো এ্যাকাউন্ট ছিল। সে বই কোথায়?

‘ব্যাঙ্কে যাবার আগে কিছু খেয়েছিলে তোমরা?’

‘মনে নেই।’ কিছু মনে পড়ছে না শমিতার। সে সব ভুলে যাচ্ছে। আজ দু বছরের বেশি হয়ে গেল তার কোনও কিছুই মনে পড়ে না। এ রোগটা আগেও ছিল। ছিল ছোটবেলা থেকেই। তাতে সামান্য কিছু সমস্যা তৈরি হতো না যে তা নয়। সবাই জানতো বড় হতে হতে সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই রোগটা তার চলে গিয়েছিল। দু বছর হলো সেটা আবার ফিরে এসেছে। ‘আমি জিজ্ঞেস করছি ব্যাঙ্কে যাবার আগে কিছু খেয়েছিলে তুমি?’

‘কে জানে আমার কিছু মনে পড়ছে না।’

‘মনে পড়ছে না বললে হবে? মনে তোমাকে করতেই হবে। দিদি, তুমি বুঝতে পারছো না তোমার কতো কী ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।’

গত আড়াই বছর সে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়িয়েছে তার চাকরিতে। এখন ঝাড়গ্রামে ওদের বিরাট কাজ হচ্ছে, মা খবর পাঠিয়েছে, তাই চলে আসতে বাধ্য হয়েছে শমিতার ভাই নম্রদীপ। সে দিদিকে এটা ওটা নানা প্রশ্ন করতে থাকে। কোনও প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারে না শমিতা। ওদের মা শেফালিকা দীপুকে বলেন, অবনী ওর নামে নানা অভিযোগ করে যাচ্ছিল। কোথায় পাস্‌বই, কোথায় গ্যাসের বই, কোথায় আলমারির চাবি ও নাকি কিছুই বলতে পারে না। বাড়ি ভাড়ার রসিদ, টেলিফোন, ইলেকট্রিকের বিল, লন্ড্রির বিল সব হারিয়ে ফেলছে, কোনটা দিয়েছে কোনটা দেয়নি কিছুই তার মনে থাকে না।

অবনী চক্রবর্তী একটা স্কুলে পড়াতো। ইতিহাস। কখনও মাইনে পেত কখনও পেত না। সারা বছর অসুখে ভুগছে। একটা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। তার বন্ধুবান্ধবরা নকশাল

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু অবনীর গুণ আছে। নকশালদের নিয়ে লেখা তার উপন্যাস 'আগুন জ্বেলে শহরে ঘেরো' তখন রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছে। টালিগঞ্জ স্টুডিওতে যাতায়াত করতে করতে সে ছবি করা শিখেছে। কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি ছবি করেছে, বিক্রি হয়নি কিন্তু ছবিটা ভালো হয়েছে। সে গান গাইতে পারে, লিখতে পারে। একদিন ও উড়োজাহাজে উড়ে যাবে কান্ ভেনিস বার্লিন। ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল থেকে প্রাইজ নিয়ে ফিরে আসবে। শমিতা জানে ওর প্রতিভা আছে, জানে ও নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ছটফট করছে, একজন সত্যিকারের শিল্পী, ওকে সুস্থ রাখতে হবে, ওর পাশে পাশে থাকতে হবে, ওর কাছ থেকে সরে এলে ও শেষ হয়ে যাবে। অবনীর ওই রুগ্ন দরিদ্র চেহারাটা দেখে ওকে বিচার করলে ওর ভেতরকার শক্তিটা কখনও টের পাওয়া যাবে না।

দিনের পর দিন স্কুল কামাই হচ্ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত চাকরিটা ছেড়েই দিতে হয়। চাকরি করে হয়তো লেখাটা চালিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু লেখার চেয়ে তার মন তখন অনেক বেশি চলে গেছে কাট্ টু এ সাইড ট্র্যাকিং শট, কাট্ টু এ কম্পোজিট শট, লং শট, মিডিয়াম শট, ক্লোজ শটে। ছবি তাকে করতেই হবে।

'হবে না শমিতা, কিচ্ছু হবে না, আমাদের বংশে কেউ কোনওদিন শিল্পী হয়নি।'

'তুমি বিপ্লবে বিশ্বাস করো, সেই তুমি বংশও মানো?'

'বংশ মানি না, বাস্তব অবস্থাটাকে মানি, তার ওপর রং চড়াই না।'

'এত হতাশ হচ্ছো কেন, আমি তো আছি।'

'সেটাই তো ভয়।'

'কিসের ভয়?'

'সত্যিই কি আছো তুমি? এভাবে তুমিই বা কতোদিন থাকতে পারবে?'

'পারব। তুমি শুধু মন দিয়ে তোমার কাজটা করে যাও।'

'কাজ আমাকে করতে দিচ্ছে কে?'

'দেবে। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেবে। যার মধ্যে ক্ষমতা আছে সে কখনও হারিয়ে যায় না।'

শমিতা মাঝে মাঝেই মার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। মা শেফালিকাও জানেন সে টাকা তাঁর মেয়ে নিজের জন্যে নিচ্ছে না। মা তো তাঁর মেয়েকে চেনেন।

অসুস্থ হয়ে অবনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। হাসপাতালের খাবার সে মুখে দিতে পারে না। শেফালিকা নিজের হাতে রান্না করেন। সে খাবার দুবেলা নিয়ে যায় শমিতা। নিক। শেফালিকা শুধু ভাবেন ওরা ভাইবোন সাতজন। ওর নিজের মা বাবা দুজনেই জীবিত। বাড়ির একটা লোক কেউ আসে না কেন? একথা মেয়েকে বলাতে শমিতা অসন্তুষ্ট হয়। শমিতা জানায় ওর তিন দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। দুই দাদারও বিয়ে হয়েছে। একজনের শুধু হয়নি। ও বাড়ির ছোট ছেলে। বাড়ির সকলেরই ধারণা স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ও অন্যায় করেছে, বাড়িতে টাকা পয়সা কিচ্ছু দেয় না, ওর জন্যে তারা ছোটাছুটি করতে যাবে কেন? রজত বিনে পয়সায় সমস্ত ওষুধ জোগাড় করে দিচ্ছে। এবং তার কিন্তু একবারও মনে হয়নি ওর ভাইবোনদের কথা। রজত এটাকে তার সামাজিক কর্তব্য বলেই মনে করেছে, বন্ধুত্ব বলেই মনে করেছে। ওর পরিবারের লোকরা কিছু করছে না বলে বন্ধুবান্ধবরা কিছু করবে না, তা কি করে হয়? তাহলে ওদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে তফাতটা রইল কোথায়? যারা আজ ওকে উপেক্ষা করছে, অবজ্ঞা

করছে, একবারের জন্যে খোঁজও নিচ্ছে না, তারাই একদিন ওর নাম ভাঙিয়ে বলবে, অবনী চক্রবর্তী আমার ভাই, অবনী আমার ছেলে।

অবনী সুস্থ হয়। চিত্রনাট্য শেষ করে। নিজের গল্প থেকে লেখা চিত্রনাট্য। দিনের পর দিন রোদে রোদে ঘুরে বেড়ায় শমিতা। মহাকরণের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের দরজার গোড়ায় অপেক্ষা করে। ফাইল কোথা থেকে কোথায় গিয়েছে জানার জন্যে অপেক্ষা করে। একটা সময় সরকার অবনী চক্রবর্তীর ছবির জন্যে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা দেবে বলে জানায়। ফাইলে মন্ত্রীর সই হয়ে যায়। তিরিশ হাজার টাকা দিলেন শেফালিকা। আরও হাজার কুড়ি টাকা বন্ধুরা এখান ওখান থেকে ধার করে নিয়ে আসে।

আপত্তি সবচেয়ে বেশি ছিল বাবা সুপ্রিয় দত্তর।

'অবনীর গুণ আছে আমি মানছি, কিন্তু শুধু গুণ দেখে একটা লোককে সারা জীবনের সঙ্গী করা যায় না।'

'তুমি ওর মধ্যে খারাপটা কি দেখলে?'

'ওর কথায় আর কাজে কোনও মিল নেই। ওর ওই 'আগুন জ্বেলে শহর ঘেরো' আগাগোড়া ভানভনিতায় ভরা, ফাঁকিবাজি, একটা অলীক স্বপ্ন, যে স্বপ্ন দেখে তুমিও একটা মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছ।'

'কেন তুমি ওকে এত সন্দেহ করো?'

'কারণ আমি ওকে বিশ্বাস করি না।'

'ও অবিশ্বাসের কি করেছে তোমার?'

'আমি কতো টাকা রোজগার করি তুই জানিস। সে টাকা পরিশ্রম করে, সৎপথেই আমি রোজগার করি। তোর চেয়ে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আমার কম নয়। তুই আমার মেয়ে। তোর কিসে ভালো হবে সেটাই আমি চাইব। তোর বিদ্যে আছে। তার মানে এই নয় যে সব কথা আমি তোর কাছে খুলে বলব। আমি বাধা দেব না। এ বিয়ে তোমরা করতেই পারো। কিন্তু বিয়ে হবে সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। অবশ্য তোমার যা পাবার সবই তুমি পাবে, সবই তোমার জন্যে আলাদা করে রাখা আছে।'

বিয়েতে কিছুই নিতে চায় নি শমিতা। এ নিয়ে মার সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া হয়েছে। এবং মা তাকে সবই দিয়েছে। দত্তবাড়িতে সানাই বাজেনি, আলো জ্বলে নি, কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান হয় নি। অগ্নিসাক্ষী নয়, সই সাক্ষী বিয়ে হয়েছে।

অবনী চক্রবর্তীর প্রথম ছবি পরিচালকের প্রথম ছবির জাতীয় পুরস্কার পেল। দ্বিতীয় ছবি পেল স্বর্ণকমল, তৃতীয় ছবি বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। পুরস্কার পায় না। প্রচুর প্রশংসা পায়। ছবি নানা দেশে বিক্রি হয়ে যায়। অবনী চক্রবর্তীকে আর পেছনে তাকাতে হয় নি। ইতিমধ্যে সে দু তিনটে নামী কোম্পানীর তথ্যচিত্রও তৈরি করেছে। গাড়ি কিনেছে। দামি সিগারেট ধরেছে। সুস্বাস্থ্য ফিরেছে। কিন্তু পুরোনো ভাড়া বাড়িটা সে ছাড়ে নি।

মা ছেলে দুজনে উঠে পড়ে সেই পুরোনো বাড়ির পুরোনো ঘর থেকে। নম্রদীপ জিজ্ঞেস করে, 'তুমি আজ থাকবে না এখানে?' শেফালিকা বলেন, 'না, আমি চলে যাব।'

'একা যেতে পারবে তো?'

'কেন, তুই কোথায় যাবি?'

'আমি একবার অবনীদার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'ও যদি দেখা না করে?'

'ফিরে আসব।'

'দেখা হলে তোকে যদি অপমান করে?'

'নিজের বউকে দিনের পর দিন একলা ফেলে রেখে যে আর একটা মহিলার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে, যে নিজের স্ত্রীর নামে লোকের কাছে মিথ্যে রটিয়ে বেড়াচ্ছে, সে অপমান করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তার কাছে মান চাইছেটা কে? তাই বলে তাকে ছেড়ে দেবে? যে লোকটা এত টাকা পেল সে তোমার তিরিশ হাজার টাকার একটা পয়সাও শোধ দেয় নি। যেসব বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তাদের কেউ এখন ওর সঙ্গে দেখাও করতে পারে না। রজতের ছেলের জন্মদিনে একটা একশো টাকার রেলগাড়ি এনে বলেছে, 'তোর বিবাহ বার্ষিকীতে নেমন্তন্ন করিস, তোর বউকে বাংলাদেশ থেকে ওরিজিনাল ঢাকাই এনে দেব।' দেশে কি আইন আদালত কিছু নেই? চলো তোমাকে বাসে তুলে দি।'

বেল্ টিপতেই অবনী এসে দরজা খুলে দেয়। ঘাড় অব্দি নেমে আসা ভেজা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অবনী একটা সোফায় বসে। দীপুকেও বসতে বলে। পরণে পরিস্কার পাজামা গায়ে গেঞ্জি। 'বোসো আসছি' অবনী ভেতরে চলে যায়। একটু পরে একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরে সিগারেট ধরাতে ধরাতে ঘরে ঢোকে। নম্রদীপের মনে পড়ে ওর গেঞ্জি পাজামা পাঞ্জাবি, সার্টের কাপড়, প্যান্টের কাপড়, ওর ঘড়ি কাগজ কলম ফাইল, শেভিং ক্রিম, পাউডার, ব্লেড, সমস্তই শমিতার কেনা। ব্যাঙ্ক, বাজার হাট, এমনকি বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে বই আনা, সমস্ত কাজ শমিতাই করত। ছেলেকে নরেন্দ্রপুরে শমিতাই ভর্তি করিয়েছে। সংসারের যাবতীয় কাজ শমিতাই করেছে।

অবনী সামনের টেবিলটার ওপর গ্লাস সাজায়। বেল্স ওল্ড স্কচ্ হুইস্কি লেখা বোতলটা খোলে। ঢালে। আর একটা গ্লাস যখন তুলছে নম্রদীপ বলে, 'আমি খাই না।'

'এত বড় চাকরি করছ, ইঞ্জিনিয়ার ছেলে মাল খাও না?'

অবনীদা যেন তাকে এই প্রথম দেখছে।

'নাঃ।...আমি এসেছিলাম আপনার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা বলতে।'

'কি কথা?'

'গয়নাগুলো গেল কোথায়?'

'তোমার দিদি তুলে এনেছে, এনে তোমায় মার কাছে পাচার করেছে।'

'কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। তোমরা জেনে গেছ শমিতার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা জেনে গেছ এরকম একটা বদ্ধ-উন্মাদ নিয়ে আমি আর থাকতে পারছি না। আমি কার সঙ্গে থাকি, কোথায় থাকি, সবই তোমরা জানো। চল্লিশ লাখ টাকা বাজেটের একটা ছবি আমার ঘাড়ের ওপর। কাগজে নায়িকার ছবি দেখ নি?'

'না।'

'আমি যার সঙ্গে থাকি সেই আমার ছবির নায়িকা। আমি জানি ওর ট্যালেন্ট আছে। কিন্তু নতুন মুখ। আমাকে একটা রীতিমতো ঝুঁকি নিতে হয়েছে। একটা চ্যালেঞ্জ। তোমাদের ওসব গয়নাগাটি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই। আমি আমার নিজের সম্মানের কথা ভেবে,

আমার ইমেজ নষ্ট হবে এসব ভেবেই পুলিশকে কিছু জানাচ্ছি না। এসব কেচ্ছা কেলেঙ্কারির জন্যে সিনেমার কাগজগুলো তো মুখিয়ে থাকে। আমি যত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি তোমরা ততো সুযোগ নিচ্ছো। যতো নষ্টের গোড়া তোমার মা।'

ভাগ্যে রৌশনের চশমাপরা মুখটা মনে পড়ছে। নম্রদীপ ওকে ডাকে শন্‌শন্‌। নরেন্দ্রপুরে রৌশনকে একটা চিঠিতে অবনী লিখেছে তার মার বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগের কথা। তোমার মার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কদিন পরে মা তোমাকে নিজের ছেলে বলেও চিনতে পারবে না। সেদিন কোথায় থাকবে তুমি? তোমার দিদা আমাকে নানারকমভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। টিভিতে সেদিন আমার ইন্টারভিউ দেখেছিলে? মনে রেখো পিতৃপরিচয় খুব বড় জিনিস। সেটা হাতছাড়া কোরো না।

এই শন্‌শন্‌কে কোলে পিঠে মানুষ করেছে তার দিদা। যে ছেলেকে মার কাছে রেখে ওরা সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই মা নাকি যতো গণ্ডগোলের মূলে।

'তোমার মাকে আমি হাজারবার বলেছি শমিতা কিছু মনে রাখতে পারে না। তোমার মা তখন তাঁর মেয়ের হয়ে কথা বলেছেন। আমি বলেছি, ওকে এত প্রশ্রয় দেবেন না। এ রোগটাই একদিন এত অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে যে তখন আর সামলাতে পারবেন না। হলো তো, শেষ পর্যন্ত তো তাই হলো।'

'আপনি বাড়ি যাচ্ছেন না কেন?'

'ওর রোগটা কি পরিমাণে বেড়েছে সেটা তুমি জানো না বলেই এরকম প্রশ্ন করছো।'

'সেটাই কি আপনার বাড়ি না যাবার একমাত্র কারণ? আপনি তো ওকে ডক্টর মুস্তাফিকে দেখাচ্ছিলেন।'

'মুস্তাফি কোনও ডাক্তারই নয়।'

'তাহলে গিয়েছিলেন কেন?'

'তোমার মার কথায়। তারপর আমি ওকে ডক্টর সুব্রত সোমের কাছে নিয়ে গেছি। এখন তো দেখছেন নির্মল জুৎসি, ওঁর চেয়ে বড় সাইকিয়াট্রিস্ট কেউ নেই।'

'বারবার ডাক্তার পালটাচ্ছেন কেন?'

'সে উত্তরও তোমাকে দিতে হবে?'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন শমিতা আমার দিদি, ওর সঙ্গে আপনার তো ডিভোর্স হয়নি।'

'হতে কতক্ষণ?'

পর্দা সরিয়ে যে মহিলাটি ঘরে ঢোকে তাকে দেখে চমকে ওঠে নম্রদীপ। বছর তিনেক আগে পরপর বেশ কয়েকদিন দেখেছে, দেখতে হয়েছে। নম্রদীপ তার বন্ধু সুজয়কে নিয়ে গিয়েছিল একটা নামী ক্যাসেট কোম্পানির মালিক কিরণ হালদারের কাছে। কিরণ হালদারের ঘরে সে দেখেছিল এই মেয়েটিকেই। কিরণ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, কমলকলি। তার মাসখানেক পরে আর এক বড় ব্যবসায়ী, বিক্রম শিবপুরী, পার্ক স্ট্রিটে ওদের হোটেলে নম্রদীপের সঙ্গে এই মেয়েটিরই আলাপ করিয়ে দিয়ে নাম বলেছিল, চন্দনলেখা। নম্রদীপ ওর মুখ দেখে বুঝতে পারে মেয়েটিও তাকে এক মুহূর্তেই চিনে নিয়েছে। মনে পড়ছে বিক্রম ওকে সিনেমায় নামাতে চেয়েছিল। তাহলে কি অবনীর এ ছবিতে বিক্রমও টাকা ঢেলেছে? যদি ঢেলেই থাকে মেয়েটিকে সে ছেড়ে দেবে কেন? ছেড়েই যদি দেবে তাকে অবনীর হাতে তুলে দেবে কেন?

মেয়েটি তার সঙ্গে কোনও কথা বলে না। একটা গ্লাসে বেশ খানিকটা হুইস্কি নিয়ে ভেতরে

চলে যায়।

'শোনো দীপু চীফ সেক্রেটারি থেকে পুলিশ কমিশনার, এমন কোনও লোক নেই যাকে আমি চিনি না, যে আমাকে চেনে না।'

'অবনীদা আমি কাল দিল্লি যাচ্ছি। দশ দিন পরে ফিরব। এসে যদি দেখি দিদির গয়না আপনি ফিরিয়ে দেন নি, পুলিশ কমিশনার দরকার হবে না, যা করার আমি নিজেই করব।'

'তুমি আমাকে হুমকি দিচ্ছ?'

'পাগল, আপনার হাতে কি শুধু মন্ত্রী আর আমলা, কতো গুণ্ডা মাস্তানও আপনি এখন পুষতে পারেন।'

'যাও, তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। এক মিনিটও বসবে না এখানে, বেরিয়ে যাও বলছি। কি যাচ্ছো না কেন?'

এই সময় চন্দনলেখা এসে আবার ঘরে ঢুকেছে। সে অবনীকে বলে, 'কাকে কি বলছ তুমি?'

'তার মানে? তুমি ওকে চেনো নাকি?'

চন্দনলেখা উত্তর দেয়, 'সে জেনে তোমার কি লাভ?' নেশায় ঢুলছে তার চোখ, তা সত্ত্বেও অবনী ওকে ধমকে ওঠে, 'তুমি ভেতরে যাও।' চন্দনলেখা ওর এই হিংস্র চেহারাটা আগেও দেখেছে। স্টুডিওতে নয়, ঘরে। ঘরের মধ্যে সে একটা অন্য মানুষ।

'যাবো। কিন্তু যা ইচ্ছে তাই করার একটা সীমা আছে, এটা মনে রেখো।'

এই মেয়েটি কমলকলি, এই মেয়েটি চন্দনলেখা, এই মেয়েটিই ওর হাত দুটো ধরে বলে ওঠে, 'আমিও ভালো নেই নম্রদীপ।'

দশদিন নয়, সাতদিনও হয়নি, নম্রদীপকে ফিরে আসতে হলো। আবারও কাজ শেষ হবার আগেই তাকে চলে আসতে হয়। মার ফোন পেয়ে, মিটিং থেকে বেরিয়েই সে প্লেনের টিকিট কেটেছে।

নম্রদীপ চলে যায় সোমবার সকালে। বুধবার সকালে অবনীর রান্না করে যে মেয়েটি, সুষমা, সাড়ে ছটায় তার বাড়ি নুঙ্গি থেকে এসে দ্যাখে, দরজায় বাইরে থেকে শেকল তোলা। সে একটু অবাক হয়। ভাবে দিদি আশেপাশে কোথাও গেছে। শেকল খুলবে কিনা ভাবতে ভাবতেই খুলে ফেলে। সামনের ঘর পার হয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। এবং সে দেখতে পায় খাবার টেবিলের নীচে পড়ে আছে দিদি। দিদি মানে চন্দন। দুদিকের বাড়ির লোকজন এসে হাজির হয়। ডাক্তার ডাকা হয়। মরে পড়ে আছে ডাক্তার এটা জানিয়ে দেয়। পুলিশ আসে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে জানা গেছে মুরগীর মাংসে বিস ছিল। এক টুকরো মাংস টেবিলের নীচে পড়ে ছিল। সেটা পরীক্ষা করা হয়েছে। ওই টুকরোটা তার হাত থেকে কিংবা মুখ থেকে পড়ে গিয়েছে।

দীপু রিদুমামাকে জিজ্ঞেস করে, 'মা কোথায়?' মামা বলেন, 'শমির বাড়িতেই তো রয়েছে। যখন তখন পুলিশ আসছে, ওদের দুজনকেই কোথাও যেতে বারণ করেছে।'

'দুজন মানে?'

'শমি আর অবনী।'

নম্রদীপ শমিতার বাড়িতে আসে। এসে শুনতে পায় দুজনকেই থানায় নিয়ে গেছে। দীপু থানায় আসে। একটা ঘরে ওদের দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওকে ঢুকতে দেয়া হয় না। দীপু একটা ফোন করতে চায়। করে। একটু পরেই তাকে ভেতরে ডাকা হয়। চারজন লোক ঘিরে বসে আছে শমিতা আর অবনীকে।

একজন অবনীকে বলছে, 'আপনার কথা অনুযায়ী সোমবার সকাল দশটায় আপনি চলে আসেন আপনার স্ত্রী শমিতার কাছে। আপনার পেটে ব্যথা হচ্ছিল, অনেকদিন আগের সেই ব্যথাটা রবিবার মাঝরাত থেকেই হচ্ছিল। ব্যথাটা যখন প্রচণ্ড বেড়ে যায় তখন আপনি চলে আসেন। ডাক্তার দেখালেন না কেন?'

'আমি ওর কাছে আসার পর থেকে ব্যথাটা একটু কমছিল। ওকে ডাক্তারের কথা বলেছিলাম। ও বলল, এটা তোমার সেই ব্যথা নয়, এই ব্যথাটা তুমি মদ খেয়ে তৈরি করেছ। তাছাড়া তোমার ডাক্তার এখন বাইরে গেছে। বৃহস্পতিবার ফিরবে। আমি বুঝতে পারছিলাম ও রেগে আছে। সেটাই স্বাভাবিক। আমি চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকলাম। সত্যিই মদ খাওয়ার মাত্রা আমার বেড়ে গিয়েছিল। শমিতা সেটা জানে। আমারও মনে হলো অন্য ডাক্তার দেখানো ঠিক হবে না। ব্যথা তো একটু কমছে। দেখিই না।'

'সোম মঙ্গল দু' দুটো দিন আপনার পাশের ভাড়াটেরা কেউ আপনাকে দ্যাখেনি, আমরা ওদের জিজ্ঞেস করেছি।'

'আমি তো বিছানা থেকে দুদিন উঠতেই পারিনি। পাশের ভাড়াটে আমাকে দেখবে কি করে?'

'কিন্তু কেউ একজন বুধবার ভোরেই আপনাকে দেখেছে।'

'হ্যাঁ, দুদিন শুয়ে থাকার পর আমি সামনে একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।'

'যদি বলি মঙ্গলবার রাত্তিরেই আপনি এসেছেন।'

'না, আমি সোমবার সকালে এসেছি ।'

'ওটা আত্মহত্যা নয়। কেউ না কেউ ওর খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। খাবার মানে শুধু মুরগীর মাংস।'

'ওটা হত্যা না আত্মহত্যা আমি জানি না। আমি শুধু আপনাদের এটুকু বলছি যে আমি সোমবার সকাল থেকেই ছিলাম শমিতার কাছে।'

'কিন্তু উনি তো কিছুই মনে করতে পারছেন না।'

'পারবেন।' অবনী শমিতার দিকে তাকায়, 'কিছুই মনে পড়ছে না তোমার? শমি, তোমাকে যে মনে করতেই হবে। নাহলে এরা আমাকে ছাড়বে না। চেষ্টা করো, চেষ্টা করলেই তোমার সব মনে পড়বে। শমি, তুমি কি বুঝতে পারছো না আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। সোমবার সারাদিন আমি তো কিছু খাই নি। মঙ্গলবার দুপুরবেলা তুমি মাছের ঝোল করেছিলে মনে নেই? বলো আমি কি সোমবার সকালেই চলে আসিনি, কেন মনে পড়বে না, বলো, তুমি বলো।' এতগুলো কথা শোনার পর শমিতা যখন বলে, 'আমার কিচ্ছু মনে পড়ছে না' নম্রদীপ তার দিকে চেয়ে দেখতে পায় দিদির মুখে তখন অনেক কিছুই মনে পড়ছে।

দিকনির্ণয়

রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিট থেকে এই দক্ষিণে চলে আসার পর এক বছর হয়ে গিয়েছে আজ পর্যন্ত গ্যাসটা পেল না হিমাংশু! পুরোনো পাড়ার গ্যাসের দোকান থেকে ট্রান্সফার স্লিপ কিন্তু সে নিয়ে এসেছিল। এখন গ্যাস না পাবার কারণ তার রেশন কার্ড হয়নি, রেশন কার্ড না হবার কারণ সে যে এই ফ্ল্যাটের নতুন ভাড়াটে এটাই সে প্রমাণ করতে পারছে না। রাজবল্লভ স্ট্রিটে রেশন কার্ড সারেনডার করে আসার সময় তারা অবশ্য বলেছিল, 'আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার অফিসে এই সার্টিফিকেট দেখালে নতুন কার্ড সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবে।' হিমাংশুর বাড়িওলা ভাড়ার রসিদ দেয় না। রেশন অফিস বলছে, তার বাড়ি ভাড়ার রসিদ অথবা তার নামের ইলেকট্রিক বিল, কিছু একটা দেখিয়ে তো প্রমাণ দিতে হবে যে, সে এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। হিমাংশু ফ্ল্যাটের মালিকের কাছ থেকে রেভিনিউ স্ট্যাম্পে সই করিয়ে একটা টাইপ করা মানি রিসিট এনে জমা দেয়, এবং সেটা জমা দেবার জন্যে দুঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। রেশনিং অফিসার তাকে বলেন, 'এ তো আপনি যে কারও কাছ থেকেই নিয়ে আসতে পারেন, এর সঙ্গে বাড়িওলার রেশন কার্ডের জেরক্স কপি জমা দিতে হবে।' ফ্ল্যাটের মালিক শৈলেন চক্রবর্তী জানান তাঁর বাড়িতে রেশন তোলা হয় না, রেশন কার্ড তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

আজ এক বছর হয়ে গেল ন'টাকা দশ টাকা লিটার কেরোসিন কিনে তার সংসার চলছে। তার নিজের সময় হয় না, কেরোসিন জোগাড় করতে হয় তার বউ সুকন্যাকে। বাজারে পাওয়া না গেলে অনেকটা পথ হেঁটে বস্তির ভেতরে গিয়ে আনতে হয়। রেশন কার্ড থাকলে গ্যাসটা হয়ে যায়। শৈলেনবাবুর ধারণা রেশন কার্ড হলে গ্যাস হবে, গ্যাস হলে এখানে সে জাঁকিয়ে বসবে, সহজ উঠতে চাইবে না, যতই দু'বছরের চুক্তি হোক না, উঠলেও নগদ টাকা চাইবে।

'শৈলেনবাবু থাকেন কোথায়?'
'সল্ট লেক।'
'সল্ট লেকের কোথায়?'
'বৈশাখীতে ভাবা ইনস্টিটিউটের কোয়ার্টারে।'
'চলো আমার সঙ্গে।'
'এখনই?'
'এক্ষুনি। অনেক সময় লাগবে। বিজন সেতুর মুখ থেকে সি. টি. সির বাসে চলে যাবো, চলো।'

ভাবা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বিশাল আবাসনের একতলায় বন্দুকধারী পাহারাদারকে জানাতে হয় তারা কোথায় যাবে। লিফটে চড়ে আটতলায় উঠে আসে দুজনে। হিমাংশু আর পলাশ। কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে যিনি সামনে এসে দাঁড়ান, তিনিই শৈলেন চক্রবর্তী।

'ভেতরে আসুন।'

তারা ভেতরে ঢোকে। সিংহাসনের মতো দেখতে দুটো সোফায় দুজনে বসে। 'কি ব্যাপার বলুন।'

পলাশ বলে, 'উনি তো আপনার ফ্ল্যাটের ভাড়াটে। ওর সুবিধে অসুবিধে এসব দেখা আপনার কর্তব্য। মাসে দু হাজার টাকা ভাড়া আপনি নিচ্ছেন, কুড়ি হাজার এ্যাডভান্স নিয়েছেন। আমাকে আপনি দেখেননি কখনও, কিন্তু ফ্ল্যাট তৈরি করার সময় এলাকার সকলের কাছে আপনি আমার নাম শুনেছেন। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। দেখা আমিই করিনি। আজ আমি নিজেই দেখা করতে এলাম। আমি এসছি আপনার রেশন কার্ডটা নিয়ে যেতে। জেরক্স করে আধঘণ্টা পর দিয়ে যাবো।'

শৈলেনবাবু উঠে দাঁড়ান, বিশাল এই হলঘরটা নিঃশব্দে হেঁটে যান, প্লাসটিকের খামে ভরা রেশন কার্ডটা নিয়ে ফিরে আসেন, পলাশের হাতে তুলে দেন, জিজ্ঞেস করেন, 'চা না ঠাণ্ডা, কি খাবেন বলুন।' পলাশ উত্তর দেয়, 'কিছু খাবো না। আমরা উঠছি। আধ ঘণ্টা পর এসে কার্ডটা ফেরৎ দিয়ে যাবো।'

দুদিনের মধ্যে হিমাংশু এবং তার স্ত্রীর রেশন কার্ড হয়ে যায়, দুদিনের মধ্যে বাড়িতে গ্যাসের ডবল সিলিন্ডার চলে আসে। গুণ্ডা নয়, মাস্তান নয়, কোনও পার্টির মেম্বার নয়, অথচ গোটা এলাকায় কী অবিশ্বাস্য দাপট এই পলাশ রায়চৌধুরী নামে লোকটার। যেখানে যার যা সমস্যা তার সামনেই এসে দাঁড়িয়ে পড়ে পলাশ, সমাধানের একটা রাস্তা খোঁজে, পেয়েও যায়, শান্তিপূর্ণ সেই পথ খুঁজে না পেলে বিরোধী পক্ষ ভয় পায়। চৌতিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর বয়েস, জুলজি নিয়ে এম. এস. সি পাশ করেছে, চাকরি করতে তার ভালো লাগে না, একটা ছাপাখানা চালায়, 'হৈমন্তী প্রিন্টিং', তার মায়ের নামে। দারুন সিল্কস্ক্রিনের কাজ হয়। তার চেহারার মধ্যে কেমন একটা নির্মল আত্মনিমগ্ন ভাব আছে। সে কোথাও আত্মসমর্পণ করে না, সকলের জন্য সকলের আগে সে এগিয়ে আসে। যে কোনও হৃদয়কে বিনম্র করে দেবার এক সহজাত শক্তি যেন সর্বক্ষণই কাজ করে তার মধ্যে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভেঙে যায় তার সহজ শিষ্টতা। সে যেন সকলের সঙ্গে জড়ানো পলাশ।

এই এলাকার একেবারে শেষ প্রান্তে শেষ বাড়িটি কৃষ্ণগোপাল সরকারের। বাড়ির পাশে একটা বিরাট পুকুর। পুকুরটার মালিক কিন্তু কৃষ্ণগোপাল নয়। পুকুরে প্রচুর মাছ হয়। পুকুরের মালিক কৃষ্ণগোপালকে প্রায়ই মাছ দিয়ে যায়, সে মাছ কৃষ্ণগোপাল একা নেয় না, এ বাড়ি সে বাড়ি দিয়েও আসে।

'হৈমন্তী প্রিন্টিং'-এর ঘরে বসে চা খেতে খেতে কৃষ্ণগোপাল সুখবরটা পলাশকে দিলেন, ওরা মল্লিকাকে পছন্দ করেছে, বিয়ের দিনও পাকা করে গেছে। কিন্তু এরকম অবস্থাপন্ন ঘরে মেয়ের বিয়ে সে দেবে কি করে? ওর মার তো কোনও সোনাদানা নেই, জমানো টাকাও কিছু নেই। তার তো হাত পা এখনই কাঁপছে। ব্যবসাটা চালাচ্ছে বলে সংসারটা কোনওরকমে চলছে, ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি করেছিল, দুখানা ঘর, ঘরের পেছন দিকে ঢাকা জায়গাটায় তার বাল্‌ব্ তৈরির কারখানা, পাঁচজন কর্মচারীকে মাইনে দিয়ে (তার মধ্যে তিনজন মহিলা) মাসের শেষে জমানোর মতো টাকা আর থাকে কোথায়? বাল্‌বের অর্ডার তো প্রচুরই পায়, কিন্তু সাপ্লাই করার মতো ক্যাপিটাল তো হাতে থাকে না। ভাগ্যিস ভগবান তার মেয়েটাকে এত সুন্দর করেছে। নিজে

সে কোনওরকমে ইস্কুল ফাইনালটা পাশ করেছিল আর তার মেয়ে মল্লিকা মাধ্যমিকে স্টার, উচ্চ মাধ্যমিকে ফাস্ট ডিভিশন, জিয়োগ্রাফিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছে। বড় শান্তিপ্রিয় বড় নিরীহপ্রকৃতি কৃষ্ণগোপাল এমন বাড়িতে তার মেয়ের বিয়ের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। শেওড়াফুলিতে ওদের বিশাল বাড়ি, জুটমিলের মালিক ওরা। পাত্র অজয় তার মাকে নিয়ে মেয়ে দেখতে এসেছিল। কৃষ্ণগোপালের ঘরে তাদের বসাবে কোথায়? সামনে বিশ্বাসদের বাড়িতে তাই ওদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভদ্রমহিলা বলে গেলেন এমন হাসিখুশি একটি মুখশ্রী তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলের জন্য কিছু দিতে হবে না।

দিতে হবে না বললে তো আর হয় না। মেয়েকে বিয়ের আসরে বসাতে গেলে কিছু গয়নাগাটি তো মেয়েকে পরাতে হবে।

'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, সব হয়ে যাবে।'

'কি করে হবে?'

'বললাম তো সে ভাবনা আমার। অন্তত বিয়ের কার্ডের খরচাটা তো লাগছে না।'

'কার্ড তো ছাপবেন কিন্তু সে কার্ড দেবেনটা কাকে?'

'যারা কানের দুল, গলার হার, হাতের চুড়ি, ছেলের সোনার বোতাম, ধুতি পাঞ্জাবি এসব দেবে, তাদের হাতে তুলে দেবেন আমার ছাপানো কার্ড।'

'তারা কারা?'

'তারা আমাদের চারপাশে যারা রয়েছে তারাই হিরণ ঘোষ, শিবানী, শুভেন্দু বিশ্বাস, যুথিকা পিসি, অরবিন্দ, গৌতম, শ্যামলকাকা, সোনালী এই যারা আমাদের চারপাশে এত বাড়ি ঘরদোর করেছে তারাই। মল্লিকার কতো গুণ। ওর স্বভাব, ওর অপূর্ব গলা, এসবের জন্যেই তো সবাই ওকে ভালোবাসে। ওর বিয়েতে দেখবেন সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বিয়েতে যা যা লাগে, সব সবকিছু এরাই দেবে।'

'কি করে গিয়ে আমি এদের কাছে হাতে পাতবো পলাশ বাবু?'

'আপনি কেন হাত পাতবেন, ওরা নিজেরাই হাত বাড়িয়ে দেবে।'

'না, আমি পারব না, ওদের কাছে গিয়ে আমি বলতে পারব না।'

'বলতে আপনাকে হবে না। কারও কাছে আপনাকে যেতে হবে না। আমি যাবো, আমি মানে আমরা। কাউকে জোর করব না, যার যা ইচ্ছে হয় দেবে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি চলে যান।'

হিমাংশু আর সুকন্যাকে নিয়ে পলাশ বেরোয়। যা সে আশা করেছিল, তার অতিরিক্ত তার চেয়ে অনেক সম্ভ্রমপূর্ণ প্রতিশ্রুতির সামনে দাঁড়িয়ে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়, মানুষ এখনও এত ভালো আছে কি করে? কাউকে নির্দিষ্ট কিছু দিতে বলা হয় না। তারা নিজেরাই বলতে থাকেন, কেউ দেবেন বালা, কেউ গলার হার, কেউ চুড়ি, কেউ আংটি, কেউ বোতাম, যে যার সাধ্য অনুযায়ী দেবেন।

কলকাতার দক্ষিণে পুরোনো এই এলাকা নতুন করে তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন সব বাড়ি উঠছে। নানা জায়গা থেকে মানুষজন এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করেছে, ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার অধ্যাপক সরকারি বেসরকারি চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী সবরকম মানুষই এখানে আসছে।

'সবই তো হলো, কিন্তু বিয়েটা হবে কোথায়?'

এ এলাকায় বিয়ের জন্যে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। পেতে গেলে অনেক দূরে যেতে হবে। হাজার হাজার টাকা দিয়ে বাড়ি নেয়ারও কোনও মানে হয় না। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটার পাশ দিয়ে এগিয়ে আসে হিমাংশু আর পলাশ। সামনেই চমৎকার একটা একতলা বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। পাশে গ্যারাজ। বিশাল গেটের সামনে একজন বৃদ্ধ বসে আছে, বোধহয় কেয়ারটেকার।

'বাড়িতে লোকজন আসে নি এখনও?'

'না। সামনের মাসে আসবে।'

'ঘটফট দেখছি, মনে হয় গৃহপ্রবেশ হয়ে গেছে, আপনি কে?'

'আমিই তো দেখাশোনা করি।'

'মালিক থাকেন কোথায়?'

'বেহালা। ব্রাহ্মসমাজ রোডে।'

ঠিকানা নিয়ে পলাশ আর হিমাংশু হাজির হয় সেখানে।

কি কারণে বাড়িটা দু'দিনের জন্যে চাইছে, পলাশ তা বিস্তৃতভাবে জানায় বাড়ির মালিক ভাস্কর মল্লিককে। এভাবে অজানা অচেনা কিছু লোকের হাতে একটা বিয়ে উপলক্ষে নিজের এত শখ করে তৈরি করা বাড়িটা ছেড়ে দিতে রাজি হননা ভাস্কর মল্লিক।

'আমি কথা দিচ্ছি আপনার বাড়ির কোনও ক্ষতি হবে না, হলে তার দায়িত্ব আমার।'

'আপনি কে?'

'আমি কে সেটা আপনি ওখানে গিয়ে যখন বাস করবেন তখনই জানতে পারবেন। আমি পলাশ রায়চৌধুরী। বাড়ি ভাড়া নেয়ার ক্ষমতা থাকলে তো আপনার কাছে ছুটে আসতাম না।'

'না, আমি দিতে পারব না।'

কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে পলাশের চেহারায় কি যেন দেখতে পায় ভাস্কর মল্লিক। লোকটার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে যেন বড় কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। মত পালটে যায়।

'ভালোই হয়েছে আপনারা এসেছেন। এমন একটা শুভ কাজে আমি তো আর বাধা দিতে পারি না। আমি কাল গিয়ে কেয়ারটেকারকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আসব। আপনারা ওর কাছ থেকেই চাবিটা নিয়ে নেবেন। আর শুনুন, আমার বসার ঘরটায় একটা বড় ঝাড়লণ্ঠন লাগিয়েছি, গ্র্যান্ড হোটেলে হায়দারাবাদের একটা নীলাম ছিল সেখান থেকে কিনেছি, একটু দেখবেন, ও জিনিস সহজে পাওয়া যায় না।'

দু'মাসের মধ্যে গোটা এলাকার চেহারা একেবারে হঠাৎই বদলে গেল।

দু'তিনটে রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়ে উঠল, নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় নেমে চারপাশ অস্থির করে তুলল। রাজনৈতিক দলের লোকরা জেনে গেল এ এলাকায় এরা মানে অর্থাৎ সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে একটি মাত্র লোককে, অর্থাৎ পলাশ রায়চৌধুরীকে। এরকম একটা লোককে নিজেদের দলে নিয়ে আসতে পারলে, সমস্ত এলাকাটাই চলে আসবে পার্টির মুঠোর মধ্যে। রাজনৈতিক দলগুলি চেষ্টা চালিয়ে যায় পলাশকে পাবার জন্যে।

একটা অটোরিকশার অ্যাকসিডেন্ট ঘিরে বিরোধ তখন একেবারে তুঙ্গে।

ইনকাম ট্যাক্স ডাক্তার বিশ্বরূপ চৌধুরীকে নানারকম ঝামেলায় ফেলেছে। তাঁর ধারণা ছিল ইনকাম ট্যাক্সের ওপর মহলে যথেষ্ট পরিচিতি আছে পলাশ রায় চৌধুরীর। তিনি তার সাহায্য

চেয়েছিলেন। বিনিময়ে তাঁর বাড়ির একতলায় তুলে আনতে বলোছিলেন হৈমন্তী প্রিন্টিং। কিন্তু কিছুই কোনও কাজে লাগল না। একদিন ভোররাতে সি. বি. আই. রেইড হয়ে গেল তাঁর বাড়িতে।

'ওর সাহায্য চাইতে যাওয়াটাই আপনার ভুল হয়েছে।'

'কেন?'

মন্ত্রীর ছেলে মনোময় দত্তের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ডাক্তার চৌধুরীর।

'ইনকাম ট্যাক্সে ওই যে আপনার সম্পর্কে ইনফরমেশনগুলো সাপ্লাই করে নি, আপনি জানছেন কি করে?'

'হ্যাঁ, ওকে আমি অনেক গোপন কিছুই বলে ফেলেছিলাম।'

'ওকে বিশ্বাস করে আপনি ভুল করেছেন। এখানকার লোকজন ওকে যে কি মনে করে কে জানে। সেদিন আমন আলির অটোতে যে অ্যাক্সিডেন্ট হলো. তা নিয়ে তো একটা ছোটোখাটো দাঙ্গা বেধে যেত। সমস্ত গোলমালটা আমিই তো থামিয়েছিলাম। অথচ এখানকার লোকরা ওকেই হিরো বানিয়ে দিল। ঠিক আছে, এখনও আমি আমার পার্টির ছেলেদের তো ওর পেছনে লাগাই নি। যেদিন ওদের ক্ষেপিয়ে দেব সেদিন এখান থেকে ও পালাবার পথ খুঁজে পাবে না।'

'মনোময়, তুমি কি তোমার বাবাকে দিয়ে কিছু করাতে পারবে বলে মনে হয়?'

'চেষ্টা তো করব, কিন্তু কিছু হবে কি না আমি বলতে পারছি না।'

'হৈমন্তী প্রিন্টিং'এ এসে হাজির হয় মনোময় দত্ত। নেতাজি ইনডোরে বম্বে কলকাতার শিল্পীদের নিয়ে এক বিরাট ফাংশান অরগানাইজ করেছে মনোময়। শুধু টিকিট নয়, সিল্কস্ক্রিনে এক হাজার কার্ড ছেপে দিতে হবে, ওইসব কার্ডে ডোনেশান তোলা হবে। কিন্তু টিকিট এবং কার্ড ছেপে দেবার জন্যে সে কোনও টাকা দিতে পারবে না।

'সে কি?'

'এত অবাক হবার কি আছে? কার্ডের পেছনে না হয় হৈমন্তী প্রিন্টিং-এর সৌজন্যে এই কটা কথা লিখে দেবেন। আপনার বিজ্ঞাপন। কতো বড় বড় লোকের কাছে কতো বড় বড় কোম্পানিতে যাবে এসব কার্ড তা জানেন? আমাদের সুভেনিরও তো একজন বিনে পয়সায় ছেপে দিচ্ছে।'

'তা দিতে পারে, কিন্তু আমি পারব না। যে এত বড় ফাংশান করতে পারে, সে কার্ড ছাপার টাকা দেবে না এটা কি হয়?'

'মনোময় দত্ত চাইলে সবই হয়।'

'তার মানে?'

'তার মানে, এই আমি ম্যাটার রেখে গেলাম। এই হচ্ছে টিকিট আর এই হচ্ছে কার্ড। তিনদিন পরে বৃহস্পতিবার এসে নিয়ে যাবো।'

মনোময় বেরিয়ে যায়।

প্রেস বন্ধ করে পলাশ হিমাংশুর বাড়ি আসে। হিমাংশু বলে, 'করে দিন পলাশদা, যা বলছে করে দিন। ডাক্তার চৌধুরী কিছুদিন আগেই ওদের অনেক টাকা দিয়েছে। আরও টাকা তার কাছ থেকে ওদের পাবার কথা। ডাক্তারের বাড়িতে রেইড হবে ওরা ভাবতেও পারেনি। লক্ষ লক্ষ টাকা, বাক্সভর্তি সোনা সি. বি. আই নিয়ে গেছে। রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় যা বলছে মেনে নিন। ওরা এত হতাশ হয়ে রয়েছে যে, সেই হতাশা থেকে ওরা যা

খুশি করে ফেলতে পারে।'

'একটা কাজ অন্যায় জেনেও সে কাজটা করতে বলছ?'

'তা বলছি না, কিন্তু গোটা এলাকার চেহারা কী দ্রুত বদলে যাচ্ছে দেখেছেন?'

'না! তোমাদের কাছে এসে কোনও লাভ হলো না। ভাবলাম এখানে এসে মনটা শক্ত করে বাড়ি ফিরব, তা না, উল্টে দুর্বল করে দিচ্ছ, ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।'

সুকন্যা চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢোকে।

'কিসের ভয় পলাশদা?'

'শোনো সুকন্যা, রাজনীতি জিনিসটা মানুষের কল্যাণের জন্য, সেই রাজনীতি যদি দুর্নীতির ওপর টিকে থাকতে চায় তা খুব বেশিদিন টেকে না।'

'টেকে পলাশদা। টিকছে বলেই তো মানুষ এত স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে, নিজের কথা ছাড়া সে আর কিছু ভাবছে না।'

সুকন্যা তার স্বামীকেই সমর্থন করে আর সেটা করে পলাশের মুখ চেয়ে। তার যেন কোনও বিপদ না হয়। পলাশ তাদের পরম আত্মীয়। একজন সত্যিকারের বন্ধু হবার জন্যে যে যে গুণ থাকার দরকার সবই তার আছে। হয়তো বা দু'একটা গুণ না থাকলেও চলত।

প্রেসের কর্মচারী মৃন্ময় পলাশকে মনে করিয়ে দেয়, 'দুটো দিন কিন্তু চলে গেছে পলাশদা, হাতে আর মাত্র একটা দিন, আপনি বললে সারা রাত জেগে কাজটা কিন্তু এখনও করে দেয়া যায়। চাইলে আর একটা দিন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, আপনার থাকতে হবে না, আমরা রাত্তির জেগে কাজ তুলে দেব।'

'কে এই লোকটা যে তার জন্যে তোমাদের রাত জেগে কাজ করতে হবে?'

'ও কতোরকম কাণ্ড করেছে আপনি জানেন না পলাশদা।'

দেখতে দেখতে তিনটে দিন কেটে যায়। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় নটা নাগাদ তিনজন যুবক সহ মনোময় 'হৈমন্তী প্রিন্টিং'এ এসে হাজির হয়। পলাশ আর হিমাংশু শচীনের ব্যাটিং নিয়ে আলোচনা কবছিল।

'হয়েছে?'

'না।'

'কি বাকি আছে কি?'

'হাতই দিই নি তো বাকি থাকবে কি?'

'আমি যে বলে গেলাম আজ আসব।'

'কিন্তু আপনি তো বলেছেন টাকা দেবেন না।'

'হ্যাঁ বলেছি।'

'তাহলে কার্ড টিকিট এসব হবে কি করে?'

মাতাল মনোময় এগিয়ে এসে চেয়ার থেকে টেনে তোলে পলাশকে।

'ইনকাম ট্যাক্সকে পেছনে লাগিয়ে ডাক্তার চৌধুরীকে তুমি নিঃস্ব করে দিয়েছ, ভেবেছ তুমি নেতা হয়েছ, এই প্রেসে আমি আগুন ধরিয়ে দেব, তোমাকে আমি ভিখিরি বানিয়ে ছাড়ব।'

এত বছরের মধ্যে কেউ তাকে একটা মন্দ কথা বলে নি, কেউ কখনও তাকে হুমকি দেয়ার সাহস পায় নি, সেই পলাশকে এখন দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরেছে মাতাল মনোময়, তাকে

ঠেলতে ঠেলতে সে দেয়ালের দিকে টেনে নিয়ে চেপে ধরে। তিনজন যুবক মনোময়কে ঘিরে রেখেছে। হিমাংশু সেখানে ঢুকতে পারছে না, ছাড়িয়ে আনতে পারছে না পলাশকে। আর সেই মুহূর্তেই পলাশের মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিশোধ নেয়ার এক হিংস্র শক্তি, কে যেন বলে ওঠে, সহ্য কোরো না এই অপমান, আঘাত, পালটা আঘাত করো পলাশ।

এবং সত্যিই সে আঘাত করে। এক ধাক্কায় দুটি যুবককে সরিয়ে দেয় তার সামনে থেকে, মনোময়কে ছিটকে ফেলে দেয় মেঝেতে, তারপর মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে, তার চুলের মুঠি ধরে তুলে নিয়ে আসে তাকে রাস্তার ওপর। মনোময়ের সঙ্গে আসা তিনটি যুবকও তখন নেশায় ঢুলছে, ফলে তারা আর বাধা দিতে পারে না। পাশেই রাখা ছিল পানের দোকানের লোহার বালতিটা, (যাতে মধুয়া পান ধুয়ে নেয়), পলাশ সেই বালতিটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে সেটা ঘুরিয়ে মেরে দেয় মনোময়ের মাথায়। তার নাক মুখ মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে, রাস্তায় গড়াতে থাকে রক্তাক্ত মনোময়। সঙ্গে আসা তিন যুবকের নেশা যেন অনেকটা কেটে যাচ্ছে, এতক্ষণে যেন তারা কি ঘটেছে সেটা খানিকটা অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তারা ট্যাক্সি ডাকতে চেষ্টা করে। হাসপাতালে নিতে হবে মনোময়কে। ট্যাক্সি পেয়ে যায়। তারা চিৎকার করে ওঠে, "মনোময়কে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে ফিরে আসছি আমরা, দেখি তোকে কে বাঁচায় আজ? কাল সকালে তুই আর পলাশ থাকবি না, তোকে আমরা লাশ বানিয়ে ছাড়ব।'

ওরা ট্যাক্সিতে মনোময়কে তুলে নিয়ে চলে যায়। বাড়িতে বাড়িতে জানালা বন্ধ হয়ে যায়, আলো নিবে যায়। রাস্তায় চায়ের দোকানদার তার সরঞ্জাম গুটিয়ে নেয়, উনুন নিবিয়ে দেয়। রাত দশটায় গভীর রাত্রি নেমে আসে।

হিমাংশু বলে, 'আজ বাড়ি যাবেন না পলাশদা, ওরা একটু পরেই ফিরে আসবে। আজ রাতটা আপনি আমার কাছে থাকুন। গ্রিল ভেঙে তো আর ঢুকতে পারবে না।'

'পাগল হয়েছ তুমি? সুকন্যা রয়েছে না। তোমাদের হয়তো কিছু করবে না। কিন্তু এই অবস্থায় সুকন্যা এসব সহ্য করতে পারবে না।'

'তাহলে চলুন থানায় চলে যাই।'

'থানায় আমি অনেকবারই গেছি, সে তো গেছি অন্য লোকের জন্যে, নিজের জন্যে আমি থানায় যেতে পারব না।'

'পুলিশের সাহায্য ছাড়া আজকের রাতটা কাটাবেন কি করে?'

'হ্যাঁ, আজ রাতটা কোনওরকমে কাটাতে পারলে কাল সকালে উঠে অন্য কিছু ভাবা যাবে। রাতটা এখন কাটাবো কোথায়?'

'একটা কথা বলব পলাশদা?'

'বলো।'

'একটা বাড়ি অন্তত ওরা খুঁজে পাবে না। চলুন কৃষ্ণগোপালের বাড়ি যাই।'

'ঠিক বলেছ, ওখানেই চলে যাই, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। সুকন্যা একা রয়েছে। এতক্ষণে ওর কাছে অবশ্য খবর পৌঁছে গেছে।'

'আপনাকে একা ছেড়ে দেব?'

'কিছু হবে না, তুমি যাও।'

এই এলাকায় একেবারে শেষ প্রান্তে পুকুরপাড়ে কৃষ্ণগোপালের বাড়ি। পলাশ রিকশা থেকে

সেখানে এসে নামে। পলাশ কৃষ্ণগোপালকে বলে, 'আজকের রাতটা আপনার বাল্‌বের বাক্সগুলোর পেছনে শুয়ে বসে কোনওরকমে কাটিয়ে দেব, ভোরে উঠে চলে যাব। আপনি কি কিছু শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। দুটো ছেলে এসে বলে গেল মন্ত্রীর ছেলেকে আপনি মেরেছেন, তারা নাকি আপনাকে ছাড়বে না।'

'তারা কারা?'

'পুকুরের মালিক ওদের রেখেছে, মাঝে মাঝে এসে দেখে যায় কেউ মাছ চুরি করছে কিনা।'

'আপনার বাড়িতে ওরা আমাকে খুঁজতে আসবে না। আপনার কোনও ভয় নেই। বাল্‌বের ওই বাক্সের পেছনে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।'

'রিকশাওয়ালা তো দেখে গেল।'

'ওকে মেরে ফেললেও ও বলবে না।'

'পলাশবাবু ওরা তো শুধু আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে না। বাক্সের মধ্যে কয়েক হাজার বাল্‌ব রয়েছে, ওরা ভেঙেচুরে সব তছনছ করে ফেলবে। পলাশবাবু দোহাই আপনার, আমাকে আর এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবেন না।'

'ঠিক আছে, আমি যাই তাহলে।'

পলাশ কৃষ্ণগোপালের উঠোন থেকে নেমে আসে। রাস্তা অন্ধকার। পলাশ অন্ধকারে হাঁটতে থাকে। কোনদিকে যাবে সে বুঝে উঠতে পারে না।

খনন

শুধু যে বইয়ের পাতাগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছে তা নয়, সেই স্তূপীকৃত ছেঁড়া পাতায় দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এর আগে অন্য অনেক রকম তাণ্ডব সে করেছে কিন্তু আগুন নিয়ে এই মারাত্মক খেলা সে কখনও করেনি। সমস্ত বাড়িটাতেই আগুন ধরে যেত, জয়িতা যদি ঠিক সময়ে এসে হাজির না হতো। জিদ্দির মাও এই সময় বাড়ি ছিল না, অসময়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়েছিল। কেন এরকম কিছু করে বসে. এ পর্যন্ত কেউ তার কোনও কারণ বাতলাতে পারেনি।

সে তো তার দোতলার ঘরের বারান্দায় বসে থাকে চুপচাপ। জানলার ধারে একটা চেয়ারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। রাস্তার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার, প্রতিবন্ধী ছেলেটা ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ইস্কুলের ব্যাগ পিঠে নিয়ে গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছে ছায়ায় রোদে, বাজারের শেষ সবজি নিয়ে ভ্যানরিকশা চালিয়ে ফিরে যাচ্ছে বুড়ো লোকটা, গাছের শুকনো ডালে বসে পাখিরা নতুন পাতায় গন্ধ ঠোকরায়, নীল, বাদামি, সবুজ, ধূসর, কমলা, সাদা রঙে ভেসে যায় মডার্ন, গোখেল, অশোক, সাখাওয়াত, সাউথ পয়েন্ট।

কিছুক্ষণ পরই সে ফিরে আসে তার ঘরে। দরজা বন্ধ করে দেয়। রঙিন পর্দা নামিয়ে জানালাগুলো সব আটকে দেয়।

কোনও শিশু কিংবা বালক তার বন্ধু নয়। কোনও খেলা সে পছন্দ করে না। তার কোনও সাথী নেই, খেলার সাথী তো দূরের কথা। একদিন মুখে তার কথা ফুটেছিল ঠিকই, কিন্তু বাবা কিংবা মাকে সে কোনওদিন বাবা কিংবা মা ডাকেনি। কোনও শারীরিক পঙ্গুতা তার নেই। বাংলা ক্যালেন্ডারে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের গায়ে যে রং ফুটে বেরোয় সে রকম তার গায়ের রং। তার অস্বাভাবিকতা তার অসুস্থতা ধরা পড়ে যেদিন সে প্রথম কথা বলতে শেখে সে দিন থেকেই। বড় হয়ে অনেকবার সে একদিন দুদিনের জন্যে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে কেউ জানতে পারেনি, আবার হারিয়েও যায়নি কখনও, নিজে নিজেই ফিরে এসেছে, কোথায় গিয়েছিল সে কিছুতেই মনে করতে পারেনি। সে আপন মনে গান করে, গলায় সুর আছে। জয়িতা একজন গানের মাস্টার এনেছিল ওকে গান শেখাবে বলে। যেদিন তিনি আসেন ওর মুখ থেকে একটা শব্দও তিনি বার করতে পারেননি। এক ঝট্‌কায় চায়ের কাপটাকে ছিটকে ফেলে দেয় হারমোনিয়ামের ওপর। অথচ মাস্টার বেরিয়ে যেতেই ওর ঘর থেকে গান ভেসে আসে, 'মোর ভাবনারে কী হওয়ায় মাতালো, দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।'

একটার পর একটা ইস্কুল থেকে অভিযোগ আসতে থাকে তাই সব স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে অশোক জয়িতা এখন ওকে ঘরেই বসিয়ে রেখেছে। জয়িতার পাশাপাশি জিদ্দির মাও ওকে সারাক্ষণ পাহারা দিচ্ছে। পাহারা মানে ওর ঘরে বসে পাহারা নয়, সর্বক্ষণ ওর ঘরের বাইরে বসে থাকা।

এরই মধ্যে কোন ফাঁকে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ও ঢুকেছে অশোক জয়িতার ঘরে। আলমারি থেকে নামিয়ে এনেছে সব চেয়ে দামি বাংলা আর ইংরেজি বইগুলো, সেগুলো থেকে কিছু বই বাছাই করে মেঝেতে এক জায়গায় জড়ো করে পাতাগুলো কুটি কুটি করে ছিঁড়েছে, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

ও এরকম ছিল না। মানে এতটা ভয়ঙ্কর ছিল না। একবার শুধু ইস্কুলে একটা নিচু র‍্যাকে রাখা পাঁচ-ছখানা মানচিত্র কোত্থেকে একটা কাঁচি নিয়ে এসে এমাথা ওমাথা কেটে টুকরো করে ফেলেছিল।

নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বসে থাকে। যতক্ষণ সময় খাটের ওপর থাকে তার চেয়ে বেশি সময় নীচে সেই উঁচু খাটটার পাশেই বসে থাকে। কখনও সাদা দেয়ালের ওপর পাঁচ পাঁচটা আঙুল রেখে মেঝেতে বসে থাকে হাঁটু মুড়ে। নিজের মুখে কখনও সে খাবার কথা বলে না। অনেকদিন এমনও হয়েছে ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। উদয়পুরি হরিৎবর্ণ পাথরের ওপর অন্নবর্ণা নৈরাজ্য ও হঠকারিতায় জয়িতার চোখে জল আসে।

পনেরো বছরের একটা ছেলের মা কোনওদিন জানতেও পারেনি কী খেতে ভালবাসে তার ছেলে, খিদে কি কখনও পায় তার ছেলেটার? দশ পনেরো মিনিটের বেশি তার ঘরে সে আলো সহ্য করতে পারে না। আলো নিবিয়ে অন্ধকারে সে বসে থাকে। জয়িতা জোর করে তাকে নিয়ে আসে ড্রয়িং রুমে। সেখানেও টিভি চললে সে বসে থাকতে পারে না। অতএব এ বাড়িতে টিভি প্রায় কারোই কখনও দেখা হয় না। ড্রয়িংরুমে একটা নাইট ল্যাম্প জ্বালিয়ে সন্ধেবেলা বসে থাকে বাবা মা ছেলে। নিজে থেকে কখনও সে খাবার টেবিলে আসে না। মা তাকে তার হাত ধরে নিয়ে আসে। তিনজনে একসঙ্গে খেতে বসে। অশোক জয়িতা ভাত খায়। ওর ডিশে মা তিনটে রুটি দিলে এক আধখানা খেয়ে সে উঠে পড়ে। মাছ তরকারি কখনও ইচ্ছে হলে খায় কখনও ফেলে দেয়, নিঃশব্দে উঠে পড়ে। বারান্দায় এসে বসে। বড় বড় গাছগুলো দূরের আলো আড়াল করে রাখে, গাছের পাতায় অন্ধকার দুলতে থাকে। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টাই তার ভালো লাগে। মনে হয় ওই অন্ধকার তাকে ডাকছে, বলছে নেমে এসো, চলে এসো, এসো আমরা মাঠের কাছে যাই, ঘাসের ওপর যাই, জলের কাছে যাই। আহা এ সময়টা যাতে না ফুরোয়। এই আকাশে তারা ফুটুক সে চায় না। তবু ফোটে। জয়িতা ডাকে। সে ঘরে চলে যায়। ও আমাকে ডাকে কেন? ও আমার কে? এই অশোক লোকটাই বা কে? ওরা তো কেউ অন্ধকার থেকে উঠে আসে না। অন্ধকার তো ওদের কখনও ডাকে না, ওরা আমাকে ডাকে কেন?

তিন চারদিন আগে মদের সুদৃশ্য বোতলটা মেঝেতে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলেছিল হিমু। টেবিলের ওপর বাক্সটা পড়ে থাকে। কারুকার্যকরা রুপালি বাক্সটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে অশোক, তাপউত্তাপহীন উদাসীনতায় দেখতে থাকে CHIVAS REGAL. founded 1801. CHIVAS Brs. Premium Scotch whisky. Aged 12 years. হিমুর ওপর রাগারাগি করার চেয়ে বাক্সের গায়ে কী লেখা আছে সেটা পড়াই বরং ভাল এই ভেবেই সে পড়তে শুরু করে, Distinguished by its light, lingering aroma, full, smooth, palate and balanced flavour with a hint of smoke Chivas Regal is a scotch of subtle and complex character. অশোকের হাত থেকে বাক্সটা কেড়ে নিয়ে দুহাতে দুমড়ে মুচড়ে চিৎকার করে ওঠে জয়িতা, 'তুমি কি মানুষ?'

'কেন কী হয়েছে কী? বাক্সের লেখাটা তো কোনওদিন পড়িনি।'

'দড়ি দিয়ে ওর হাত পাগুলো শক্ত করে বেঁধে রাখো। ওকে শাস্তি দাও, নাহলে ওর শিক্ষা হবে না।'

'বাঁধতে তো পারি কিন্তু তুমিই তো গিয়ে আবার খুলে দেবে।'

'না খুলব না। তুমি বাঁধো ওকে, এক্ষুনি বাঁধো।'

এরকম অনেক কিছুই ও ভেঙেছে। মাদার টেরিজার কাচের মূর্তি, বাহারি টেবিল ল্যাম্প, বিবাহ বার্ষিকীতে উপহার পাওয়া ইরানের আয়না, জয়িতার গুরুদেবের ছবি, সুইস ক্লক, ব্রুট স্প্রে লোশন-এর শিশি।

এই ছেলেকে নিয়ে কোথায় না গিয়েছে ওরা? কী না করছে? কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপাথি, সবরকম চিকিৎসা করিয়েছে, সবরকম টেস্ট, এক্সরে, স্ক্যান সবই করিয়েছে। কিছুতে কিছু হয়নি, দুচারদিন ঠিক থেকেছে, তারপর আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। আলো জ্বাললেই চিৎকার করে উঠেছে, 'নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, আমার চোখ জ্বলে যাচ্ছে, আমার পেট জ্বালা করছে', তখন অশোক জয়িতা ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে ওর অন্ধকার ঘরটাতে। ও ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে জয়িতা দেখেছে বারান্দায় চেয়ারটার ওপর বসে আছে হিমু, একা একা গুনগুন করছে।

'তোমার ভয় করছে না জয়িতা?'

'কীসের ভয়?'

'আগুনের? আজ নয় বইয়ের ওপর দিয়ে গেছে, কাল যদি ও নিজের গায়ে ধরিয়ে দেয়?'

'কী বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি। আর ওকে বিশ্বাস করা যায় না। যে কোনও অঘটনের জন্যে মনটা এখন শক্ত করে ফ্যালো।'

জয়িতার সারা শরীরটা কেঁপে ওঠে। কেউ কি তার গলা চেপে ধরে তার নিঃশ্বাস রোধ করছে? ছেয়ে ফেলে অপরিমেয় নৈরাশ্য, তাকে হতবুদ্ধি করে দেয়। অন্তঃকরণের আর এক নাম কি আতঙ্ক?

'তুমি কাল একবার সন্তোষপুরে যাও।'

'শিশিরকণা মানসিক হাসপাতাল?'

'হ্যাঁ।'

'ওই নামটার ইতিহাস জানো?'

'না।'

'তাহলে শোনো। শিশির সিংহরায়ের ঠাকুর্দা ছিলেন ময়মনসিংহের জমিদার। ওরা এই বঙ্গে চলে আসার পরও বহুদিন ওদের জমিদারি টিকে ছিল, সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছিল ওদের নানারকম ব্যবসা। কোলিয়ারি ছিল। এক একটা বাড়ি ছিল এক একটা রাজপ্রাসাদের মতো। এইসব সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা মোকদ্দমা, কোলিয়ারিতে একের পর এক খুন, অ্যাক্সিডেন্ট, মদের নেশা সব ধসিয়ে দিয়েছে। তার ওপর কেউ কেউ সিনেমার প্রোডিউসার হতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলেন শিশির সিংহ এবং তাঁর স্ত্রী কণা। শুধু উত্তরপাড়া কোন্নগর নয়, কলকাতায়ও ছিল বিরাট দু চারটে বাগানবাড়ি। শিশির সিংহের একমাত্র ছেলে সে জন্মসূত্রে বিকৃতমস্তিষ্ক, পাগল। একদিন পঁচিশবছর বয়েসের পাগল ছেলেটাকে নিয়ে বাবা মা বেড়াচ্ছিলেন লেকের ধারে, বিকেল শেষ হয়ে তখনও সন্ধে হয়নি, বাবা মার চোখের আড়ালে লেকের জলে ঝাঁপ দিয়ে ছেলেটা ডুবে গেল, যখন ওকে তুলে আনা হলো তখন আর সে বেঁচে নেই। শিশির সিংহ ওদের নিজেদের ওই বাড়িটা, সন্তোষপুরের ওই বিশাল বাড়িটা

মানসিক হাসপাতাল তৈরির জন্যে দান করে দিলেন। সেই হাসপাতাল এখন চালাচ্ছে তোমার সাত্যকি মজুমদার।'

'আমার সাত্যকি?'

'হ্যাঁ। তারপর শোনো। ডক্টর সাত্যকি মজুমদার শুধু এখানেই কনসালটেন্ট সাইক্রিয়াটিস্ট নয়, নির্মলা কেনেডি সেন্টার, সেন্ট জোসেফস হোম রামকৃষ্ণ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এরকম আরও কয়েকটা জায়গায় সাইক্রিয়াটিস্ট হিসেবে যুক্ত। এছাড়া যায় দমদমের পোলক এভিনিউতে, বারাসাতের পুরাতন বাজারে।'

'এত খবর তুমি ওর সম্পর্কে জানো?'

'জানি। কিন্তু এখন আমার ভয়টা তো অন্য জায়গায়।'

'কি সেটা?'

'এই আগুন। সত্যিই যদি ও গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, পুলিস তো বিশ্বাস করবে না। বলবে ওকে সহ্য করতে না পেরে আমরাই লাগিয়েছি। তোমাকেও ছাড়বে না।'

'তুমি কাল সন্তোষপুরে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দ্যাখো।'

'সত্যি বলোতো তুমি কি হিমুর জন্যেই আমাকে ওখানে যেতে বলছ?'

'না হলে কার জন্যে?'

অশোক জানে একথার কোনও উত্তর নেই।

যা হারিয়ে গেছে তাকে যে জয়িতা আগলে বসে আছে তা নয়। কিন্তু হারিয়ে গেছে কথাটা খুব জোর দিয়ে বলা যায়ই বা কী করে?

সব জায়গাতেই তো চেষ্টা করেছে অশোক। কোথাও কিছু হলো না। বরং দিনে দিনে আরও খারাপ হতে লাগল। আরও কষ্টকর আরও অসহ্য। আরও ভয়াবহ। হঠাৎ আজ শিশিরকণার কথা তাহলে উঠছে কেন!

কারণ শুধু শিশিরকণা মানসিক হাসপাতালের বাগানঘেরা বাড়ি নয়। একটা অন্য কাহিনী লুকিয়ে আছে এর পেছনে। একটা অন্য ঘটনা, অন্য গল্প।

তিন বোন তারা। সবিতা, অনিতা, জয়িতা। কঠোর শাসনে বড় হচ্ছিল তারা। ইস্কুল কলেজ ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া ছিল মানা। ইস্কুল কলেজ যেত বাড়ির গাড়িতে। পাড়ার কোনও লোকের সঙ্গে ছিল না ওদের মেলামেশা। ওদের বাবা বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী নিরুপম ভাদুড়ি। তাঁর ছোটমেয়ে জয়িতার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর আবিষ্কার করেন সেই চিঠি, যে চিঠি জানাচ্ছে, তাঁর মেয়ে একবছর আগে রেজেস্ট্রি বিয়ে করেছে পাড়ার ছেলে সাত্যকি মজুমদারকে। রাগে দুঃখে অপমানে লজ্জায় তাঁর মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। সাত্যকির বাবা সুকুমার মজুমদার পাড়ায় একটা ছোট্ট লন্ড্রির মালিক। লন্ড্রির সামনে একটা কয়লার উনুন জ্বলছে। গাড়িতে যেতে যেতে প্রায়ই দেখতে পান নিরুপমবাবু, সুকুমার আর তার ইস্তিরিওলা শাড়ি ধুতির দু প্রান্ত টানটান করে ধরে রেখেছে, কাপড়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে কাপড়ের মাড় ছাড়াচ্ছে। নিরুপম ভাদুড়ি গড়িয়াহাটের নামকরা বস্ত্র ব্যবসায়ী, কী করে তিনি মেনে নেবেন এই বিয়ে? তাছাড়া বিয়ের দিনক্ষণ যে তিনি অন্য জায়গায় ঠিকই করে ফেলেছেন।

একটা অ্যাক্সিডেন্ট করাতে হবে। সে তো যে কারুরই হতে পারে।

সেদিন উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলেন শরৎ জেঠু।

'সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভুলেও একাজ কোরো না। তাছাড়া এতে কি তোমার মেয়েকে বাঁচাতে

পারবে?'

'এ মেয়েকে বাঁচিয়ে রেখেই বা কী হবে? যে মেয়ে তার বাবা মার কথা ভাবে না, বংশের মানসম্মানের কথা ভাবে না, আমি সে মেয়ের মুখও দেখতে চাই না।'

শরৎজেঠু নিরুপমের আপন দাদা না হলেও ওদের পারিবারিক বন্ধু, ওদের ব্যবসায় পরামর্শদাতা, নিরুপমের মেয়েদের তিনি নিজের মেয়ের মতোই মনে করেন, ওদের ভাল মন্দে, সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে শরৎজেঠু ওদের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

'মাথা গরম কোরো না, এসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, সব দিক বিবেচনা করে এগোতে হবে।' কিন্তু কী করে মাথা ঠাণ্ডা রাখবে নিরুপম? মেয়ে যে তার মাথা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

'ছেলেটা খারাপ কীসের? লেখাপড়ায় এত ভালো। সারা পাড়ায় তো এরকম আর একটা ছেলেও নেই।'

'ওর বাবা কি করে, জানো?'

'জানব না কেন?'

'তাহলে?'

'লন্ড্রিটা একদম চলে না। আলমারির কাচগুলো সব ভেঙে গেছে, কাঠের তাকে ইস্তিরিকরা জামাকাপড়গুলোর ওপর সারাক্ষণ বাস রাস্তা থেকে ধুলো উড়ে আসছে। সাত্যকির বোন কুন্তলার চেহারা তো খারাপ নয়, ওর বাবা সুকুমার টাকার অভাবে মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছে না।'

'এসব কথা শুনে আমার লাভটা কী!'

'শুনে বুঝতে পারছ না?'

'পারছি। কিন্তু টাকা দিয়ে কি কিছু করা যাবে?'

'যাবে। সাত্যকি টিউশানি ক'রে নিজের পড়া চালায়। বাজারে সুকুমারের অনেক দেনা।'

'কত টাকা লাগবে?'

'তুমি হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ করতে পারবে?'

'পঞ্চাশ কেন? দরকার হলে আমি লাখটাকা খরচ করব।'

'অত লাগবে না। কোর্টে তিরিশ, সুকুমার কুড়ি, ওতেই হয়ে যাবে। আরও দু চার এদিক ওদিক লাগতেও পারে। কিন্তু সাত্যকির কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না, তাতে তোমার নিজের বিপদই শুধু বাড়বে। পাড়ায় কোনও লোকের সঙ্গে তোমাদের সদভাব নেই, কেউ তোমাদের দেখতে পারে না, কারণ তোমাদের টাকা, তোমাদের এই ঐশ্বর্য, এই বাড়ি গাড়ি, গড়িয়াহাটের ঝলমলে দোকান—তার ওপর তুমি কারও সঙ্গে তোমার মেয়েদের মিশতে দাওনি। মনে রেখো সাত্যকির কোনও ক্ষতি হলে আমিও কিন্তু তোমাদের পাশে থাকব না। তাছাড়া আর একবার ভেবে দেখতে পারো। ছেলেটা বিদ্বান বুদ্ধিমান সৎ, বিয়েটা মেনে নিলে ক্ষতি কী?

'ক্ষতিটা তো তোমার বোঝার কথা নয়। বাবা-মার কষ্ট তুমি কী করে বুঝবে?'

শরৎজেঠু চুপ হয়ে যান। এই একটা কারণের জন্যেই নিজের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে শরৎজেঠুর কোনওদিন কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়নি। তাদের কাছ থেকে যত তিনি দূরে সরে এসেছেন তত আঁকড়ে ধরেছেন নিরুপম ভাদুড়ির পরিবার ও তার তিন কন্যাকে। বড় দুটো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আছে তো শুধু জয়িতা। জেঠিমাকে নিয়ে ভারী সুখী তাঁর জীবন। কেন তিনি এই আঘাত সহ্য করবেন? সেই মুহূর্তে চলে যেতে পারতেন শরৎজেঠু। যাননি সাত্যকির কথা ভেবে

জয়িতার মুখে জমে ওঠা ভয়দগ্ধ বিষণ্ণতা দেখে। উভয়ের স্বার্থের কথা ভেবে এক অহংকারী বাবার উৎপীড়ন থেকে ওদের বার করে আনার একটা পথ তিনি খুঁজছিলেন। শরৎজেঠু চলে গেলে কে উদ্ধার করবে জয়িতাকে?

সাত্যকি একবারও চোখ তুলে তাকায়নি ওর দিকে।

অথচ রেজিস্ট্রি বিয়ের দিন সাত্যকি বলেছিল 'তোমার সঙ্গে আমার তো ভালো করে আলাপই হয়নি, তুমি ভালো না খারাপ, তুমি ঠাট্টা বোঝো, না বোঝো না, তুমি বুদ্ধিমতী না নির্বোধ কিছুই জানি না কিন্তু এত তড়িঘড়ি তোমাকে বিয়ে করে ফেললাম, কেন করলাম বলো তো?'

তার উত্তর জানা ছিল না জয়িতার। জয়িতা ওকে পালটা জিজ্ঞেস করেনি 'কেন?' সাত্যকি নিজেই বলেছে 'তোমার মুখটা এত সুন্দর, তোমার এই চেয়ে থাকাটা এত সুন্দর, পাছে অন্য কেউ তোমায় নিয়ে চলে যায়, তাই রেজিস্ট্রিটা ক'রে রেখে দিলাম। যাঃ, এরপর দুনিয়ায় আর কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই।'

সেই সাত্যকিকে যা যা করতে বলা হয় সবই সে নিঃশব্দে করে যায়। কোনও প্রতিবাদ করে না। একটিও কথা বলে না। কাগজে সই করে সে চলে গিয়েছিল। সই করেছিল জয়িতাও। জজসাহেব তাঁর বন্ধু, কোর্টে শরৎজেঠু কী ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই জানেন।

সন্তোষপুরে গিয়ে কথা বলে আসে অশোক।

একটা বিরাট বাগানবাড়ি এখন মানসিক হাসপাতাল। ভেতরে গাছপালা আছে, ফুলের বাগান আছে, খোলা মাঠ আছে, দিঘি আছে, বাইরে থেকে কোনও আন্দাজই করা যায় না কি বিরাট এই শিশিরকণার এলাকা। ডক্টর সাত্যকি মজুমদারই এখানে সর্বময় কর্তা। তাঁর সঙ্গে অশোকের কথা হয়। ৪৫ দিন এখানে থাকতে হবে। বাবা মা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এই ৪৫ দিনের মধ্যে কেউ একবেলার জন্যেও এসে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। এক বেলা কেন, এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ দেখা করতে পারবে না। কারও হাত দিয়ে কোনওরকম খাবার পাঠানো চলবে না। জামাকাপড় ফলমূল কোনও কিছুই পাঠানো যাবে না। এখানে ভর্তি করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই, অসুখবিসুখ হলে চিকিৎসার দায়িত্ব শিশিরকণারই, কোনও ওষুধপত্রেরও দরকার হবে না, শিশিরকণাই সব জোগাড় করে আনবে। টেলিফোন করেও কোনও খবর নেওয়া চলবে না। তেমন খবর কিছু থাকলে শিশিরকণা থেকেই খবর পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কাল যদি ভর্তি করা হয়, ৪৫ দিন পরে জুন মাসের ১৫ তারিখ সকাল এগারোটার সময় ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে। জামাকাপড় যা আছে দেড় মাসের মতো হিসেব করে দিয়ে দিতে হবে। ওরা নিজেরাই বাছাই করে নেবেন যখন যা দরকার। দশ হাজার টাকা লাগবে এবং পুরো টাকাটাই কাল ভর্তি হবার সময় অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে দিতে হবে।

পাঠাবার ইচ্ছে ছিল না অশোকের।

দেড়মাসের মধ্যে বাড়ির লোক একবারের জন্যও দেখা করতে পারবে না এরকম অদ্ভুত চিকিৎসাপদ্ধতি যে আছে তা তার জানা ছিল না। নাকি এত বছর পরে অন্য কোনও খেলা খেলতে চায় সাত্যকি? কী সেই খেলা? অশোকের অনিচ্ছা যে যথেষ্ট তীব্র তা বুঝতে অসুবিধে হয় না জয়িতার। তা সত্ত্বেও সে হিমুর জামাকাপড়গুলো একটা ছোট্ট সুটকেসের মধ্যে গোছাতে থাকে। 'তোমাকে কিন্তু একাই যেতে হবে,' অশোকের কথার দ্বিধাহীন উত্তর আসে, 'ঠিক আছে।'

মুখে বলেছে বটে কিন্তু অশোক যে সত্যিই ওর সঙ্গে আসবে না এতটা ভাবতে পারেনি জয়িতা।

তবু শিশিরকণায় সে একাই নিয়ে এল হিমুকে।

'ভালো হয়ে যাবে তোমার ছেলে।' বহুবছর পর আজ আবার দুজনের মুখোমুখি দেখা।

'হিমু ভালো হয়ে যাবে?'

'তাই তো চাও তুমি?'

চুপ করে থাকে জয়িতা।

'কিন্তু বিনিময়ে আমারও যে কিছু চাই।'

'কী চাও তুমি?'

'যদি বলি তোমাকে?'

'আমাকে? এটা এত সহজ মনে হলো তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ। সমস্ত জীবন একটা উন্মাদ সন্তানের বোঝা বহন করার চেয়ে নিশ্চয়ই সহজ। ওর এই পনেরো বছর বয়েসটা একদিন পঁচিশ হবে তিরিশ হবে, সেই দিনগুলোর কথা তুমি ভাবতে পারছ? এই যে এতগুলো বছরের মধ্যে একটা দিনও তোমার ছেলের মুখে তুমি হাসি দ্যাখো নি, তোমার ছেলের মুখে 'মা' ডাকটা শোনোনি, ইস্কুলের পর ইস্কুল পালটেছ, পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের কাছ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে সরে একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে বন্ধ হয়ে রয়েছ, তুমি, তোমার স্বামী তোমার ছেলে, এভাবে আর কতদিন থাকবে তুমি?"

'সেখান থেকে তুমি আমার মুক্তি চাও বলেই আমাকে চাও, তাই না।'

'না। তোমার মুক্তি নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যথা নেই, একদিন আমি হেরে গিয়েছিলাম, আজ আমি জিততে চাই।'

'প্রতিশোধ নিতে চাও?'

'না, তোমার ছেলেকে ভালো করে দেওয়ার পারিশ্রমিক চাই।'

'আমিই তোমার পারিশ্রমিক?'

'ভুলে যেও না একদিন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।'

হিমুকে রেখে চলে আসে জয়িতা।

একটা একটা করে দিন গুনতে থাকে। তার ঘরে এখন আর কেউ কিছু ভাঙে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কী যেন সর্বক্ষণই ভাঙছে, ঝুরঝুর করে কী যেন পড়ছে। বারান্দায় চেয়ারটা খালি। হিমুর ঘরটা আগের মতোই অন্ধকার। ভুলেও সেখানে আলো জ্বালতে ঢোকে না জয়িতা। এত কিছু ভেঙেছে হিমু কিন্তু টেবিলের ওপর রাখা তার জলের কাচের গেলাসটা কিন্তু ভাঙেনি কখনও। সে কি গ্লাসের গায়ে দুটো হলুদ রঙের পাখি আঁকা রয়েছে বলেই?

এবং একদিন ৪৫টা দিন শেষ হয়ে যায়।

১৫ জুন সকাল এগারোটার সময় তাদের নিজেদের গাড়ি থেকে শিশিরকণার ভেতরে এসে নামে অশোক জয়িতা। তারা ডাক্তারের ঘরে এসে ঢোকে। একজন সিসটার এসে জানায় ডাক্তারবাবু নেই। 'হিমু কোথায়?' 'হিমুও নেই।' 'সে কী, কোথায় গেছে তারা?' সিসটার জানে না।

'কবে থেকে নেই।'

'দিন সাতেক।'

'কোথায় গেছে কিছু বলে যাননি?'

'না।'

'দুজনে একসঙ্গে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

বেলা বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অশোক থানায় চলে যায় ডায়েরি করতে। দুটো বেজে পনেরো মিনিটে দুজন কনস্টেবল নিয়ে শিশিরকণায় চলে আসে থানার ওসি। আড়াইটার সময় অশোক তিমির দত্তকে ফোন করে, তিমির দত্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, সি আই ডি। সাড়ে তিনটের সময় তিনিও এসে হাজির হন। একে ওকে অনেক রকম জিজ্ঞাসাবাদ করেন, কেউ কিছু বলতে পারে না। অস্থির অশোক তিমির দত্তকে বলে, 'যাহোক একটা কিছু করুন।'

চারটে বেজে দশ মিনিটে শিশিরকণায় একটা ট্যাক্সি এসে ঢোকে। ট্যাক্সি থেকে নেমে আসে হিমাদ্রি আর ডাক্তার সাত্যকি মজুমদার।

'তিমির তুই? তুইও এসে হাজির হয়েছিল? আমি অবশ্য জানতাম এরকম একটা কিছু ঘটবে।'

'ব্যাপারটা কী? কোথায় গিয়েছিলি তুই?'

'দিন সাতেক আগে হিমুকে নিয়ে দার্জিলিঙ চলে গিয়েছিলাম। ওদের টাইম দিয়েছিলাম আজ সকাল এগারোটা। এগারোটাতেই চলে যেতে পারত। কিন্তু যা হবার নয়, তা হবে কী করে? কাল সন্ধে ছটার সময় দুজনে মিলে এন জে পি ক্যান্টিনে বসে যখন ভাত খাচ্ছি পাশের লোকটা হিমুকে বলল, অত তাড়ার কিছু নেই, আস্তে আস্তে খাও। শেয়ালদা থেকে যে ট্রেনটা সকালবেলা এখানে এসে পৌঁছয় সেটাই এখনও আসেনি। এলো সন্ধে সাতটায়। আমাদের ট্রেন ছাড়ল রাত্তির বারোটায়।'

এগিয়ে আসে জয়িতা। ডাক্তার সাত্যকি মজুমদার হিমুকে জিজ্ঞেস করে, 'হিমু, তুমি কী দেখতে চাও, আলো না অন্ধকার?' হিমু উত্তর দেয়, 'আলো'। ডাক্তার তাকে আবার জিজ্ঞেস করে, 'দার্জিলিঙে একটা তিব্বতী মহিলার মৃতদেহ ওরা কী দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছিল?' হিমু ওর মার দিকে তাকায়, 'রডোডেনড্রন।' আবার প্রশ্ন করে ডাক্তার, 'জগতে তুমি কাকে সবচেয়ে ভালোবাসো?' হিমু ছুটে এসে ওর মার গলা জড়িয়ে ধরে 'আমার মাকে।'

তিমির দত্ত সাত্যকির হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে।

সিসটার হিমাদ্রির সুটকেসটা গুছিয়ে দেয়। জয়িতা দেখছে দার্জিলিঙ থেকে কেনা লাল নীল দুটো ভারী সুন্দর সোয়েটারও মহিলা ভাঁজ করে দিল। হিমাদ্রি অশোকের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসে। গাড়ি গেট পার হয়ে যাবার পরে জয়িতা অশোককে বলে, 'তোমরা একটু বোসো, ডাক্তারবাবুকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।' সে নেমে আসে। সাত্যকির সামনে এসে দাঁড়ায়। 'এই শাড়িটা চিনতে পারছ?' সাত্যকি উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, আমাদের বিয়ের দিন পরেছিলে।...হিমু ভালো হয়ে গেছে জয়িতা।'

'তোমার পারিশ্রমিক?'

'তোমার কাছেই থাক।'

বস্ত্রবিতরণ

গত বছর ওরা দিয়েছে শাড়ি আর কম্বল।

এবার দিচ্ছে ধুতি প্যান্টের পিস্ আর শাড়ি। এ কদিন বস্তির ঘরে ঘরে গিয়ে পার্টির ছেলেরা জেনে নিয়েছে কার ঘরে কী দরকার। যাই নাও পরিবার পিছু দুখানা। যার যেটা দরকার সে অনুযায়ী নিতে পারো। ছেলেরা তাদেব প্যাডে লিখে নিয়েছে। পার্টির ছাপমারা একটা কাগজে পরিবারের কর্তার নাম লিখে কাগজটা ওদের দিয়ে গেছে। বলে গেছে, ওদের কাছে যে কাগজ আছে, সেখানে যেভাবে পরপর নাম লেখা হচ্ছে, সেভাবেই মাইকে সিরিয়ালি নাম ডাকা হবে। মন্ত্রীর হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে সোজা হাঁটা ধরলেই হবে না, আবার গিয়ে চেয়ারে বসতে হবে।

খুবই পরিশ্রম করছে ছেলেরা। বস্তিবাসীর উন্নতির জন্যে অনেকরকম ভাবনাচিন্তা করা হয়েছে, সেই কর্মসূচির অন্যতম এই বস্ত্রবিতরণ। গঙ্গার পাড়ে এই বস্তিগুলোর ভোট একসময়ে যারা পেত তারা এখন আর পায় না। পায় না মানে গত নির্বাচন থেকে পায় না। আগে যারা পেত তাদের রাজত্ব চলে গেছে। এর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ভোট তো পেলেই হয় না, ভোট ধরেও রাখতে হয়। কখন কোথায় কার উত্থান কেউ জানে না। পাঁচ বোতল রক্তের চেয়ে একখানা ভোটের দাম অনেক বেশি।

বড় গরিব এই মানুষগুলো। কেউ ছুতোর মিস্তিরি, রঙের মিস্তিরি, কেউ সব্জি বেচে, কেউ চা তেলেভাজা কুলফি শরবত আইসক্রিম, কেউ বজবজ বারুইপুর লোকালে আলতা সিঁদুর কাচের চুড়ি, খেলনা, লজেন্স, আয়না, চিরুনি, ধূপকাঠি, কলম, ইঁদুর মারার বিষ, দাঁত ব্যথা আর অম্বলের ওষুধ এসব ফিরি করে, কেউ পাঁচ বাড়িতে বাসন মাজে, কেউ দু বাড়িতে রান্না করে, কেউ আয়ার কাজ করে। সকলের অবস্থা তো একরকম নয়। গরিবের মধ্যেও শ্রেণীর ভাগ আছে। কেউ কারখানায় কাজ করে, কারও হাতে মেশিন ভালো চলে, কেউ খেরোর খাতা বাঁধে, কেউ টালিগঞ্জের স্টুডিওতে কাজ করে, কেউ খবরের কাগজ নিয়ে বসে, কেউ মিনিবাসে হেল্পার, কেউ জামা কাপড় ইস্তিরি ক'রে লন্ড্রিতে দিয়ে আসে। এদের ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যায় কিন্তু পাশ করা বলতে যা বোঝায় সে পর্যন্ত ক'জন আর লেখাপড়া চালাতে পারে?

বস্তির একটা ঘরে থাকেন ইন্দ্রজিৎবাবু। তাঁর পরিবারটাই সবচেয়ে ছোট। তিনি, তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে পার্বতী। ইন্দ্রজিৎ কাজ করেন 'দত্ত মেডিকেল'-এ। দরকার মতো ইনজেকশানও তাঁকে দিতে হয়, রক্ত টানতে হয়। দোকানটা এক সময় ছিল তিন ভাইয়ের। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে অতো বড় একটা ব্যবসা প্রায় ডুবিয়ে দিল। তিনজনের এখন আলাদা ব্যবসা। দোকানের মালিক ছোট ভাই নিরঞ্জন দত্ত। একুশটা কাচের আলমারির মধ্যে ন'খানাতে তালা ঝুলছে। সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই নিরঞ্জন দত্তর। সারাদিন সে রাজনীতি নিয়ে মেতে আছে। সরকার পক্ষের লোক নয় সে। তবু সবাই তাকে মান্য করে, ভয় পায়, ব্যবসায়ী সমিতির সে সম্পাদক, নাগরিক কমিটির সে কর্তা, তার ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে একশো আটটা ঢাক

আর দশখানা ব্যান্ডপার্টি যায় সারা দক্ষিণ কলকাতা কাঁপিয়ে, দোকান দেখার সময়টা কোথায়? উল্টোদিকে একটা নতুন ফার্মেসি হয়েছে, ওখানে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে লোকে ওষুধ নিচ্ছে, ইন্দ্রজিৎ শুধু ভাবেন ডাক্তারদের হাতের লেখা কি দিনে দিনে আরও দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে?

নিরঞ্জন দত্ত বলেছিল, 'আপনি কিছুতেই রাজি হবেন না।'

ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করেন, 'কেন?'

'কেন আপনি বুঝতে পারছেন না?'

'না।'

'আপনি কোথায় কাজ করেন?'

'দত্ত মেডিকেল-এ।'

'ওরা বলে বেড়াবে ইন্দ্রদার এই হাল করেছে তো নিরঞ্জন দত্ত।'

'তোমার প্রেস্টিজের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, শুধু আমার নয়, আমার আপনার দুজনেরই।'

তখন রাত আটটা। শরীর ভাল নেই ব'লে আজ তিনি দোকানে যাননি। কজ্জল পার্টির দুটো ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। একশো বাইশটি পরিবারের নাম তারা লিখেছে। ইন্দ্রদার কাছে আগেও একবার এসে ওরা ফিরে গেছে। ওদের ধারণা নিরঞ্জন দত্ত সব কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। উনি কাপড় নিতে রাজি না হলে ধরে নেওয়া হবে এর পেছনে নিরঞ্জন দত্তর হাত আছে। মালিককে খুশি করতে গিয়ে ইন্দ্রদা ওদের পার্টিকেই অপমান করছেন। পার্টি থেকে বলা হয়েছে কাপড় নিতে সবাইকে রাজি করাতে হবে। কে কোন পার্টির লোক সেটা দেখবে না। কজ্জল ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে। বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে। এত নরম হয়ে সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। বেশিক্ষণ তার ধৈর্য থাকে না। কোনও কথাই যখন কাজে লাগছে না, মেজাজ বিগড়ে যায় কজ্জলের।

'খুব পয়সা হয়েছে আপনার তাই না?'

'পয়সা? দুবেলা দুমুঠো খাবার জোটাতে সারাদিন খাটছি আর আমাকে বলছ পয়সা হয়েছে।'

'আপনার ঘরে এসে হাত জোড় করে আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি, দুটো কাপড় নিতে বলছি আর আপনি মেজাজ দেখাচ্ছেন?'

'মেজাজ তো দেখাইনি কিছু। বলেছি আমি কিছু নিতে পারব না।'

'ইন্দ্রদা শুনুন, ভোট আপনি কাকে দেন আমরা জানি।'

'জানতে পারো না তুমি।'

'আমাকে কি ভাবেন আপনি?'

'ভোট আমি কাউকেই দি না।'

'কেন, আমরা কি কিছু করিনি নাকি? কোনও ভদ্রলোক এই বস্তিতে আগে ঢুকতে পারত? এর ভেতর আমরা পাকা রাস্তা করে দিয়েছি। আগে গঙ্গার জল এসে ভাসিয়ে দিত, মনে নেই? আমরা রাস্তা উঁচু করেছি, ইলেকট্রিক এনে দিয়েছি। টিউবয়েল বসিয়েছি, রং করেছি, কি না করেছি? ছিলেন তো নরকের মধ্যে। এরা কোনওদিন টিভি দেখবে এদের চোদ্দ গুষ্টির কেউ ভেবেছে কোনওদিন? আর কি চান আপনি?'

'আর কিছু চাই তো বলিনি আমি।'

'তাহলে? আপনি না থাকলে আপনার মালিক তো দোকানটা লাটে তুলে দিত। ও তো শুষছে আপনাকে। আমি জানি ওই শালা নিরঞ্জন দত্তই আপনাকে তাতাচ্ছে।'

পার্বতী এসে ঘরে ঢোকে। দারিদ্র্যের লজ্জায় রুগ্‌ণ মেয়েটির শরীর। অসহায় লাবণ্য তার চোখে নাকে ঠোঁটে, তার রক্তহীনতায়। কজ্জলের চেহারাটা দেখেই সে ভয় পায়। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল মহাদেব। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পার্বতী।

'কি হয়েছে কি?'

'কি আর হবে, বুড়ো রোয়াব নিচ্ছে।'

'আবার তুমি মুখ খারাপ করছ?'

'এটা খারাপ কথা? এ তো সাধুভাষা।'

ঘর থেকে কজ্জল কাকারকে নিয়ে বেরিয়ে আসে। বস্তির ভেতরে বসানো নতুন ল্যাম্প পোস্টের সন্দেহজনক আলোয় পার্বতীকে একবার আপাদমস্তক দ্যাখে। বাপ এত আদর্শের বুলি ঝাড়ছে, কই মেয়ের গায়ে তো সেই আদর্শের ছিটেফোঁটাও নেই। বড় বড় কথা না বলে মেয়েটাকে একটু মাছ খাওয়া। কি হবে এদের দরদ দেখিয়ে? মেয়েটারও তো বাপের মতো দেমাক। কজ্জলের দিকে ও চোখ তুলে তাকায় না। অথচ কাকার মহাদেব এদের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলে, হাসে। হাসলে ওকে বীণা দাশগুপ্তার মতো দেখায়।

কজ্জল ওদের বলে যায় সে পার্টি অফিসে যাচ্ছে। মহাদেব পার্বতীকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার গা থেকে সুগন্ধ বেরোচ্ছে কেন?' কাকার উত্তর দেয়, 'হরিবোল শুনিসনি? মড়া ফলো ক'রে এলে আমার গা থেকেও ধূপের গন্ধ বেরোবে। তাছাড়া তুই হচ্ছিস মহাদেব, পার্বতীর গা থেকে তুই গন্ধ পাবি না, পাবো কি আমি,' পার্বতী জানতে চায়, কি বলেছে বাবা।

'কাপড় নেবে না। কজ্জলের মুখের ওপর ওকে রিফিউজ করছে। কতো বুঝিয়ে বলল কজ্জল। ইন্দ্রদা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। বলে, ভিক্ষে নেব কেন? এত লোক যারা নিচ্ছে তারা সব কি ভিখিরি?' কাকার মহাদেবের কথার মাঝখানে ঢুকে পড়ে, 'এবার কাপড়ের কোয়ালিটি একেবারে হাই ক্লাস। ওসব সন্ন্যেসী মার্কা শাড়ি ফাড়ি এবার কিছু নেই। ভাল ভাল মাল এসছে। তুই গিয়ে বাবাকে একটু বুঝিয়ে বল্। আমরা কাল সকালে আবার আসব। না নিলে তোরই লস্। হেভি লস্। দারুণ জেল্লা দেওয়া সব শাড়ি এস্ছে। আমি আর মহাদেব তোর জন্যে চয়েস ক'রে রেখে দেব। অলরেডি একখানা দেখেও রেখেছি। ওটা পরে বেরোলে তুইও মাধুরী দিক্সিত হয়ে যাবি।'

ওরা চলে যায়।

পার্বতী ঘরে ঢুকে বাবাকে জিজ্ঞেস করে 'মা কোথায়' বাবা উত্তর দেয়, 'মন্দিরে গেছে।' পার্বতী বুঝতে পারে তাদের দুজনের কেউই ঘরে না থাকায় বাবা এতখানি জেদ দেখিয়েছে। বস্তির লোকদের জন্যেই তো এই বস্ত্রবিতরণ। এ তো একটা মহৎ কাজ। বস্তিতে থাকবে তুমি অথচ বস্তির লোকদের থেকে তুমি আলাদা থাকবে, তা কি করে হয়? সত্যিই তো গরিব আমরা। মান সম্মান নিয়ে গরিবের অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। পার্বতীর মনে সন্দেহ জাগে। তাহলে কি নিরঞ্জন দত্তই বাবাকে ওদের পার্টির ওপর বিরক্ত ক'রে তুলছে? নিরঞ্জন দত্তই বাবাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে? বাবার নীতি মেনে চলা জীবনের সহজ সততার সুযোগটা সে নিতে চাইছে? বাবাকে কি দিনে দিনে এভাবেই লোকটা দুর্বল করে দিচ্ছে? এতে ওর কোনও ক্ষতি হবে না, কিন্তু এটা যে তার বাবার পক্ষে কী বিপজ্জনক বাবা সেটা বুঝতে চাইছে না।

পার্বতী বাবার জন্যে এক কাপ চা ক'রে আনে। ভাঙা চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে তিনি বলেন, 'এবার ওরা ভাল জিনিস জোগাড় করেছে, আমি জানি, কিন্তু হাত পেতে নেব কি ক'রে বল তো মা?'

'কেন নিলে কি হয়েছে, এত লোকে নিচ্ছে।'

'যারা নিচ্ছে তুই কি আমাকে তাদের মতো ভাবিস?'

'যারা নিচ্ছে তারা গরিব ব'লেই নিচ্ছে, আমরাও তো তাদের মতোই গরিব।'

'তাদের তো নিতে আমি বারণ করিনি।'

'আমার একটা কথা রাখবে বাবা?'

'কি?'

'কাল সকালে ওরা আবার আসবে। তুমি রাজি হয়ে যাও। নামটা দিয়ে দাও। না দিলে ওরা ঝামেলা করবে।'

'আর কতো নীচে নামব বল্‌ত মা?'

'তার মানে যারা নিচ্ছে তাদের তুমি ঘৃণা করো?'

'তাতে তো আমারই পাপ।...তবু কেন জানি মন থেকে জিনিসটা মানতে পারছি না।'

'না বাবা, তুমি আর আপত্তি কোরো না। কাল ওরা এলে আমি দিয়ে দেব। ফাংশানে তোমাকে যেতে হবে না। আমিই নিয়ে আসব।'

'তুই? আমি থাকতে তুই কেন যাবি? ছোট যদি হতেই হয়, আমি হবো।'

ইন্দ্রজিতের চোখে ভেসে ওঠে একটা ছবি, মাথায় ফুলের মুকুট, কানে দুল, কপালে টিক্‌লি, গলায় হার, হাতে চুড়ি, মুখে চন্দনের আলপনা, কী একটা যেন গন্ধ বেরোয় কেয়া ফুলের গন্ধের মতো, আলোর নীচে মেয়েটা বসে আছে, হাত পেতে উপহার নিচ্ছে। আর সেই মেয়ে যাবে ওদের প্যান্ডেলে বস্ত্রবিতরণ-এ? বসে থাকবে কখন তার ডাক আসে সেই জন্যে? না তা হয় না। নিজেই যাবেন তিনি। মেয়ের জন্যে কিছুই তিনি করতে পারেননি।

এখন ওকে বসিয়ে রাখবেন ওদের দয়ার সামনে?

সকাল না হতেই এসে হাজির হয় কাকার, মহাদেব।

'কি ব্যাপার, তোমরা?'

'ন'টার সময় আমাদের লটারি হবে।'

'কিসের লটারি?'

'কুড়িটা নাম তোলা হবে। সেই কুড়িজনের হাতে মন্ত্রী নিজেই প্যাকেট তুলে দেবেন। বাকিরা নেবে মন্ত্রী চলে যাবার পর। আমরা জানতে এস্‌ছি আপনি রাজি কি না।'

'রাজি।'

মহাদেব পার্টির ছাপ মারা একটা কাগজে ইন্দ্রজিতের নাম লিখে কাগজটা তাঁর হাতে তুলে দেয়। একটা ঘরকেই পর্দা দিয়ে দুখানা করা হয়েছে। তারই একখানায় ভেতরে শোয় পার্বতী। বাইরে থেকে দেখা যায় না। মহাদেবের খুব দেখতে ইচ্ছে করে ঘুমন্ত পার্বতীকে। বস্তির চেহারা সত্যিই পাল্‌টে গেছে। বেশ কিছু ঝকঝকে ল্যাট্রিন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু কেন যে ইন্দ্রদা ওদের পার্টিকে সহ্য করতে পারে না কে জানে। পারলে পার্বতীর সঙ্গে আর একটু বেশি ক'রে মেশা যেত।

'আমার নামটা লটারি থেকে বাদ দিও।'

'কেন? মন্ত্রীর হাত থেকে আপনি নিতে চান না?'

'না ঠিক তা নয়...আসলে...আচ্ছা ঠিক আছে দিও...লটারিতে নাম আমার উঠবে না।"

বিরাট প্যান্ডেল হয়েছে। দুপুর থেকে মাইকে গান বাজছে। নন্দী ইলেকট্রিক আলো করেছে। স্বপন ডেকর থেকে পাবলিকের জন্যে চেয়ার এসেছে, মঞ্চের কার্পেট, সাদা কাপড় ফুলের টব মন্ত্রীর বসার জন্যে ভেলভেট মোড়া সিংহাসন সব কিছুই এসেছে। প্রবীণ বিপ্লবী আনন্দ বিশ্বাসের হাতে মন্ত্রী তুলে দিলেন এক হাজার এক টাকা আর ধুতি পাঞ্জাবি। তারপর তিনি বললেন, এই সব মানুষেরা একদিন স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছেন। আমরা ওঁর চিকিৎসার জন্যে পি জি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের তিনতলায় ওঁকে একটা কেবিন দিয়েছি। দিয়েছি বলে নয়, খুবই সামান্য এই কাজ, কিন্তু আমি এটা উল্লেখ কবছি এই জন্যে যে, এটুকুও আগে কেউ করেনি, একজন মানুষ ছিয়াশি বছর বয়সে পৌঁছে একটা চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন, এ আমাদেরই লজ্জা।

তারপর তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন বস্তিবাসীর উদ্দেশে। জানালেন, তাঁরা সব রকম চেষ্টা করছেন বস্তিবাসীর দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ ও সুন্দর ক'রে তোলার জন্যে। মুখের কথায় কিছু হবে না। কাজ করে সেটা প্রমাণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, মাঝে মাঝে গেছি আমি ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে/ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে। আমরা ভিতরে প্রবেশ করতে চাই, খানিকটা করেওছি। যেভাবে আমরা শ্রমিক কৃষকের কথা ভাবছি সেভাবেই আমরা নানা পরিকল্পনা নিয়েছি শহরের এই পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের মানুষজনের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সুস্থ স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে, আমাদের বস্ত্র চাই। শিক্ষাও চাই।

মন্ত্রীর বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে ঘোষণা শোনা যায়, এবার লটারিতে যাদের নাম উঠেছে তাদের কুড়িজনকে একে একে মঞ্চে ডাকা হবে। যার নাম ঘোষিত হবে তিনি মঞ্চে উঠে এসে মাননীয় মন্ত্রীর হাত থেকে তার প্যাকেট নিয়ে যাবেন। একশো তেইশটি পরিবারকে এই বস্ত্রবিতরণ করা হচ্ছে।

একে একে উনিশজন লোকের হাতে মন্ত্রী প্যাকেট তুলে দিলেন। এতক্ষণ নিশ্চিত ছিলেন ইন্দ্রজিৎ কোনওদিন লটারির টিকিট না কিনলেও তিনি জানেন তাঁর নাম ওঠেনি, উঠতে পারে না। কিন্তু এখন মাইকে যে কেঁপে উঠল তাঁরই নাম। একসময় কতো গল্পের বই পড়তেন। সেই লাইনটা কখনও ভোলেননি, মৃন্ময়ী তুমি তো কখনও নিজের হৃৎপিণ্ড নিজে ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই। মেয়েটার জন্যেই তাঁকে আসতে হলো। কাকার মহাদেব, ওদের তিনি খুশি রাখতে চান।

চেয়ার ছেড়ে ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়ালেন। আশেপাশে সকলেই চেনা। কিন্তু কারও সঙ্গেই তাঁর তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। মাথা নিচু করে চললেন ইন্দ্রজিৎ। সবুজ কাপড দিয়ে মোড়া পাঁচটা ছোট্ট সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন মঞ্চে। মাইকের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রী পরিমল গুহ। ডানদিকে একটা টেবিলের ওপর উঁচু করে রাখা হয়েছে প্যাকেটগুলো। একজন মাইকে ঘোষণা করছে। আর একজন নাম লেখা প্যাকেট তুলে দিচ্ছে মন্ত্রীর হাতে। মন্ত্রী প্যাকেট তুলে দিলেন ইন্দ্রজিতের হাতে। হঠাৎ মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হলো লোকটা বিতরণের জন্যে আসেনি, এসেছে মানুষকে অপমান করতে। ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'এর মধ্যে কোনও

গৌরব নেই, কোনও সততা নেই, এটা শুধু মানুষের দারিদ্র্যকে নিজেদের কাজে লাগানো...।' মন্ত্রী বিস্মিত, 'তার মানে? ইন্দ্রজিৎ বলেন, 'মানে বুঝতে হলে যে খানিকটা অনুভূতি থাকতে হয়।' মন্ত্রী চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' মঞ্চের ওপর যারা দাঁড়িয়ে ছিল জোর ক'রে টেনে নামিয়ে আনে ইন্দ্রজিৎকে। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয় পাবলিকের কাছ থেকে। প্যান্ডেলের ভিতর থেকে তাকে বাইরে নিয়ে আসে। সার্টের বোতাম খসে যায়। ঘাসের ওপর তিনি ছিটকে পড়েন। উঠতে কষ্ট হয়। 'আপনি কাকে অপমান করছেন জানেন?'

'অপমান তো করিনি কিছু। তোমরাই আমাকে অপমান করছো।'

'কে আপনাকে চালাচ্ছে আমরা জানি।'

'যা আমি বলেছি তার মধ্যে কোনও মিথ্যে নেই।'

মাইকে শোনা যায়, আপনারা শান্ত হয়ে বসুন, আমাদের বস্ত্রবিতরণের কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলবে। আপনারা স্থির হয়ে বসুন। আমরা পর পর নাম ডেকে যাচ্ছি। আপনারা একে একে হাতে স্লিপ নিয়ে এগিয়ে আসুন।

রানীকুঠি সরকারি আবাসনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে এলো সুধীর বিনয় আর পঙ্কজ। মন্ত্রী পরিমল গুহর ঘরের দরজায় এসে বেল বাজাতেই বেরিয়ে এলো মন্ত্রীর বিশ্বস্ত কর্মচারী হৃষিকেশ।

'কি ব্যাপার এই রাতবিরেতে তোমরা?'

'পরিমলদা ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'না।'

'আমরা দু মিনিট কথা বলব।'

'দেখছি উনি আসেন কি না। বোসো এখানে।'

ওরা বাইরের ঘরের সোফায় অস্থিরভাবে বসে। পরিমলবাবু ঘরে ঢুকতেই ওরা উঠে দাঁড়ায়।

'কি হয়েছে?'

'কজ্জলকে পুলিশ ধরে নিযে গেছে।'

'কেন, কি করেছে ও?'

'নিরঞ্জন দত্ত অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিল। এর আগে অনেকবার ওর নামে মিথ্যে রিপোর্ট করেছে। থানাটা তো ও কিনে রেখেছে। ও সি ওর কথায় ওঠে বসে। আমরা তো কতোবার বলেছি লোকটাকে বদলি করুন। ও থাকলে আমরা কোনও কাজ করতে পারবো না।'

'আমাকে কি করতে হবে?'

'আপনি একবার ফোন করে বলে দিন। তাহলে রাত্তিরেই ছেড়ে দেবে।'

'ঠিক আছে, তোমরা চলে যাও।'

রাত তখন এগারোটা চল্লিশ।

মন্ত্রী পরিমল গুহ একাই বেরিয়ে পড়েন। চেতলার ট্যাক্সি। তাই রাজি হয়ে যায়। সন্ধেবেলার সেই প্যান্ডেলের কাছাকাছি এসে তিনি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেন। কি করে ফিরবেন সে নিয়ে ভাবছেন না। প্যান্ডেলে এখন আর আলো জ্বলছে না। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। পান সিগারেটের দুটো দোকান শুধু খোলা। হাতে লম্বা জবা ফুলের মালা নিয়ে দু একজন মাতাল ফিরে যাচ্ছে মায়ের মন্দির থেকে। একটা প্রাচীন বেশ্যাপল্লী আছে এখানে। ল্যাম্পপোস্টের আলো নিভে

গেছে। আদি গঙ্গার পাড় থেকে উঠে আসা মাটি ভেজা অন্ধকারে লিপস্টিক মাখা ঠোঁটগুলো টুনি বাল্‌বের মতো জ্বলছে। দুটো ছেলে শালপাতায় লেগে থাকা ঝালটক চেটেপুটে জিভে একটা অদ্ভুত শব্দ করছিল। পরিমলবাবু তাদের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'ইন্দ্রজিৎবাবু কোথায় থাকে জানেন?' ওরা ডিরেকশান দিল, 'ওই যে ডিসপেনসারিটা দেখছেন ওর সামনে দিয়ে এগিয়ে যান, দেখবেন রাস্তার ওপর পরপর সব প্রতিমা দাঁড় করিয়ে রেখেছে, আর একটু এগোলে একটা 'আফিমকা দুকান', ওরই পাশ দিয়ে ঢুকে যেতে হবে।' তারপর কি ভেবে বলল, 'চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।' অন্ধকারে ওরা মন্ত্রীকে চিনতে পারছিল না, একটু আগেই উনি বক্তৃতা দিয়ে গেছেন, ওরা তখন সানি মীনাক্‌সির 'ঘায়েল' দেখতে গেছে। আলো থাকলেও অবশ্য চিনত না।

'আফিমকা দুকান'-এর পাশ দিয়ে ওরা ঢুকে পড়ল। এর ওর তার ঘরের সামনে দিয়ে এগিয়ে এলো। একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। পরিমলের দিকে চেয়ে ছেলে দুটি বলল, 'এই ঘরটা, আপনি যান ভেতরে!'

খাটের ওপর বসে আছেন ইন্দ্রজিৎ আর তাঁর স্ত্রী। ঘরের এককোণে মেঝেতে একটা স্টোভ জ্বলছে। স্টোভে ভাত ফুটছে। সামনে বসে আছে পার্বতী।

মন্ত্রী পরিমল গুহ এগিয়ে আসেন পার্বতীর মার সামনে। পার্বতীর মা বলেন, 'দ্যাখো কি করে গেছে ওরা?' পরিমল গুহ দেখতে পান, বিছানায় বালিশে মশারিতে চেয়ারে ট্রাঙ্কে আলনায় ঠাকুরের আসনে ময়ূরপাখায় পঞ্চপ্রদীপে স্বামীজীর ছবিতে লাল আর বেগুনী রঙের শাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। টুকরোগুলোর ফাঁকে চকচক করছে সোনালি জরি, মন্ত্রীর মাথার চুলে, মুখেও জড়িয়ে যাচ্ছে জরি, হাত দিয়ে সরিয়ে মন্ত্রী পরিমল গুহ পার্বতীর মাকে বড় বিষণ্ণ গলায় বলেন, 'তুমি ওদের বললে না কেন আমি তোমাদের কে?'

ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি আমাদের কে পরিমল?'